ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

ইসলামী বিপ্লব
সাধনে সংগঠন

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.bjilibrary.com

ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

প্রকাশক

আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১
ফ্যাক্স : ৯৩৩৯৩২৭

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৫ ইং
পঞ্চম মুদ্রণ : মে ২০০৯
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
জমা: আউ: ১৪৩০

নির্ধারিত মূল্য : ৪৫.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Islami Biplob Shadhaney Sangathan Written by Professor Mohammad Yousuf Ali. Published by Abu Taher Mohammad Ma'sum Chairman, Publication Dept. Bangladesh Jamaat-e-Islami, 504/1, Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh
Fixed Price : 45.00 Only.

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

- **ইসলামী বিপ্লব** ৭
  - বিপ্লব কি? ৭
  - ইসলামী বিপ্লব কি? ৭
  - ইসলামী বিপ্লব কেন? ১৪
  - ইসলামী বিপ্লব কিভাবে? ১৫
  - ইসলামী বিপ্লবের পূর্বশর্ত ঃ ১৮
    - ১. আহবায়কের ভূমিকা ১৮
    - ২. সংগঠন ১৮
    - ৩. সক্রিয় জনমত ১৯
    - ৪. ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের একটি জোরালো আন্দোলন ২০
    - ৫. মান মোতাবেক যথেষ্ট পরিমাণ লোক তৈরী ২০
    - ৬. বলিষ্ঠ, সাহসী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্ব ২১
    - ৭. ত্যাগী ও সদা তৎপর কর্মীবাহিনী ২১
    - ৮. প্রতিরোধ শক্তি অর্জন ২১
    - ৯. ধারণ ক্ষমতা লাভ ২২
    - ১০. উপসংহার ২২

- **ইসলাম ও সংগঠন** ২৩
  - ইসলামী আদর্শ ও সংগঠন ২৩
  - ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন ২৭
  - ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের গতিধারা ২৯

- ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন ও ইসলামী বিপ্লব ৩১
  - আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ইসলামী বিপ্লব ৩২
  - আম্বিয়ায়ে কেরামের ইসলামী আন্দোলনে সংগঠন ৩৪
  - খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সংগঠন ৪০
  - সাইয়েদ আবুল মওদূদী (রহঃ)-এর সংগঠন ৪২

www.bjilibrary.com

● **সংগঠন ঃ দুর্বলতা ও মজবুতি** ৪৪
সংগঠন ৪৪
সংগঠনের দুর্বলতা ও মজবুতি ৪৭
সংগঠনের মজবুতি আসবে কিতাবে ৫৪
সংগঠনের মজবুতির লক্ষণ ৫৮

● **বিপ্লব সাধনে নিয়োজিত ইসলামী সংগঠনের রূপরেখা ও বৈশিষ্ট** ৬০
ইসলামী আন্দোলনে সংগঠনের গুরুত্ব ৬০
উদ্দেশ্যের ঐক্য ৬১
নেতৃত্বের ভূমিকা ৬৩
কর্মীবাহিনীর বৈশিষ্ট ৬৮
কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি ৭৬
গঠন প্রকৃতি ঃ গঠনত ৭৬
কর্মনীতি ৭৮
দলীয় নীতি-পদ্ধতি ৮০
কর্মপদ্ধতি ৮৪
সংগঠন পদ্ধতি ৮৬
কর্মসূচী-পরিকল্পনা ৮৭
তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও তার ব্যবহার ৯৭

● **ইসলামী বিপ্লব ঃ আল্লাহর সাহায্য ও সংগঠন** ১০০
আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ১০০
মুমিনদেরকে খেলাফত দান ১০১
বদরের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ১০৩
ওহোদের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ১০৫
খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ১০৬
হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ১০৬
যে ব্যক্তি আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন ১০৭

● **শেষ কথা** ১১১

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

'ইসলামী বিপ্লব, সংগঠন ও পরিকল্পনা' নামে আমার যে বইটি বছর তিনেক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটিকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে "ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন"।

ইসলামী বিপ্লব বাংলাদেশসহ বিশ্বের লক্ষ কোটি প্রাণের কামনা। কিন্তু এ মহা বিপ্লব সাধন কোন সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি মজবুত সংগঠনের পরিকল্পনা মাফিক কাজ। সংগঠন যদি একটি যথার্থ মানে পৌঁছায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় কর্মসূচী যথাযথভাবে আঞ্জাম দানের মাধ্যমে, তাহলে বিরুদ্ধ শক্তি যতো প্রবলই হোক না কেন আল্লাহর সাহায্যে ইসলামী বিপ্লব সাফল্য মন্ডিত হতে পারে।

এ পর্যায়ে সংগঠন সম্পর্কে আমার গভীর উপলব্ধি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বইটির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কুরআন-হাদীস ও মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর গ্রন্থসমূহের সহযোগিতা প্রয়োজনমত নেয়া হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ অংশের উল্লেখও করা হয়েছে। মোটকথা সংগঠন সম্পর্কিত আলোচনাকে শিক্ষণীয় পর্যায়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিষয়টিকে আলাদাভাবে না রেখে তাকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংগঠনের যথার্থ মজবুতি অর্জিত হলে কর্মসূচীর বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলেই কেবলমাত্র আল্লাহর সাহায্য আশা করা যায়। শেষ অধ্যায়ে এ বিষয়টি যথার্থ গুরুত্বসহ আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী বিপ্লব, সংগঠন ও আল্লাহর সাহায্য - এই ৩টি বিষয়কে বইটিতে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির মানগত উন্নয়ন ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করার সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। চূড়ান্ত রায়ের দায়িত্ব পাঠকবর্গের উপর অর্পণ করে শেষ করছি। যে কোন সংশোধনী ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমীন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
১০-৯-৯১
৪৫১, মীর হাজীরবাগ, ঢাকা-১২০৪

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

"ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন" বইটি নতুন আঙ্গিকে নতুনভাবে প্রকাশিত হলো। ইতিপূর্বে বইটির প্রথম সংস্করণ 'ইসলামী বিপ্লব, সংগঠন ও পরিকল্পনা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে বইটির ব্যাপক সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

ইসলামী বিপ্লব সময়ের দাবী। তার জন্য দরকার একটি মজবুত সংগঠনের এবং সংগঠন একটি মানে পৌঁছলেই আল্লাহর সাহায্য আসার শর্ত পূরণ হয়। তাই ইসলামী বিপ্লব চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে আল্লাহর সাহায্যেরই উপর।

এসব বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে বইটিতে। বইটি ইসলামী সংগঠনের জনশক্তির নিকট সংগঠনের একটি গাইড হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করি। বইটি থেকে সংগঠনের জনশক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থকতা লাভ করবে।

প্রকাশক

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী বিপ্লব

বিপ্লব কি?

কোন সংস্কার বা সংশোধনবাদের নাম বিপ্লব নয়। বিপ্লব মানে কোন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। হালে বিপ্লব শব্দটার খুব হালকা ব্যবহার হচ্ছে, খালকাটা বিপ্লব, সবুজ বিপ্লব। আসলে এগুলো কোন বিপ্লব নয়, এগুলো কর্মসূচী। আধুনিক বিশ্বে বিপ্লব বলতে সাধারণতঃ রক্তাক্ত বিপ্লবকেই বুঝায়। অবশ্য কোথাও কোথাও রক্তপাতহীন বিপ্লবও হয়ে থাকে। এসব বিপ্লবের অর্থ ক্ষমতার হাত বদল, কোথাও ক্ষমতাসীনদেরকে হত্যা করে বিপ্লবীদের ক্ষমতারোহন, আবার কোথাও ক্ষমতাসীনদেরকে সরিয়ে দিয়ে হত্যা না করেও ক্ষমতা পরিবর্তন হয়ে থাকে। ক্ষমতার এ পরিবর্তনকে বলা হয় বিপ্লব।

আরেক ধরনের বিপ্লব সমাজে হয়ে থাকে তা হলো, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে বিপ্লব। এটাকে বলা যায় আদর্শিক বিপ্লব। সমাজে কোন না কোন আদর্শ চালু থাকে। কোন সমাজই আদর্শ শূন্য থাকতে পারে না। সমাজে যে সব বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন চালু থাকে, যা মোতাবেক সমাজ চলে তার পিছনে কোন না কোন দর্শন কাজ করে – এই দর্শনসহ বিধি-বিধানটাই আদর্শ। যে আদর্শ মোতাবেক একটি সমাজ চলে, সেই সমাজের সকল বিধি-বিধান, আচার অনুষ্ঠানের যদি আমুল পরিবর্তন হয় আরেকটি আদর্শের ভিত্তিতে, তাহলে তা হবে আদর্শিক বিপ্লব। অর্থাৎ আদর্শিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের সবকিছুর আমুল পরিবর্তন, উলট-পালটের ফলে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ ধরনের আদর্শিক বিপ্লবই সত্যিকার অর্থে বিপ্লব।

ইসলামী বিপ্লব কি?

১. ইসলাম একটি জীবন্ত আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ঃ কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ইসলাম মোতাবেক নয়। কিছু কিছু ইসলামী আচার অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজে কায়েম থাকলেও ইসলামী শরীয়তের বিরাট অংশ সমাজে কায়েম নেই। বলতে গেলে আজকের মুসলিম সমাজ, ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ। এ সমাজে শিরকের প্রচলন আছে, কুফরী আইন-কানুন চালু আছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ ফাসেকী ও মুনাফেকীতে নিমজ্জিত। এহেন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইসলামের সঠিক জীবন-বিধানের রূপায়ণ তথা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের নাম ইসলামী বিপ্লব।

www.bjilibrary.com

২. আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে ইসলামী বিপ্লবের কথা বলেছেন ঃ اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ দ্বীনের বাস্তবায়ন বা একামতে দ্বীন শব্দ দ্বারা। বিভিন্ন নবীর নাম উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা সূরা শুরার তের নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ (سورة الشورى : ١٣)

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহ (আঃ)-কে দিয়েছিলন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন আমরা অহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা (আঃ)-কে দিয়েছিলাম। এই তাকিদ দিয়ে যে, কায়েম কর এই দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেয়ো না।" (সূরা আশ শুরা ঃ আয়াত ১৩)

উপরের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবী-রাসূলগণকে এ দুনিয়ায় প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যই হলো দ্বীনের বাস্তবায়ন বা একামতে দ্বীন।

একামত মানে বাস্তবায়ন, কায়েম করা, চালু করা, প্রতিষ্ঠিত করা, অস্তিত্ব প্রদান। দ্বীনের একামত মানে দ্বীনের বাস্তবায়ন, দ্বীন কায়েম করা, দ্বীন চালু করা, দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা বা দ্বীনের অস্তিত্ব প্রদান। দ্বীনের এই বাস্তবায়ন কোন শুন্য সমাজে করার কথা বলা হয়নি বরং নবী রাসূলগণ যে সমাজে এসেছিলেন সে সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক নতুন সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তাই ইসলামী বিপ্লব সাধনের কাজ চলেছে যুগে যুগে বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে।

৩. আল কুরআনে ইসলামী বিপ্লব সাধনের কথা বলা হয়েছে আরেকটি বাক্যাংশে ঃ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ– "অপরাপর সকল দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করার জন্য"- দ্বারা। অপরাপর দ্বীনের উপর ইসলামী জীবন-বিধানকে বিজয়ী করার অর্থই ইসলামী বিপ্লব সাধন। এই দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে আল্লাহতায়ালা আল কুরআনের তিন জায়গায় একই ভাষায় বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ–

অর্থ ঃ "তিনিই সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন আর সব দ্বীনের উপর একে (এই দ্বীনকে) বিজয়ী করা হয়।"

(সূরা তওবা ঃ আয়াত ৩৩, ফাত্হ্-২৮, সফ-৯)

www.bjilibrary.com

এ কথার সুস্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা এক হেদায়াতের বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে রাসূল সেই দ্বীনে হককে অন্যসব জীবন-বিধানের (দ্বীনের) উপর বিজয়ী করে যেতে পারেন। তাই ইসলামী বিপ্লব মানে অন্যসব দ্বীনের উপর দ্বীন ইসলামের বিজয়। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্যেই এ দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন।

৪. আল কুরআন মুমেনদেরকে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হবার নির্দেশ দেয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً-

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও।"

(সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২০৮)

ইসলামের কিছু মানা, কিছু না মানা - যেভাবে আমরা চলছি - এতে মানুষের মুক্তি নেই - না ইহকালে না পরকালে। কুরআনই ঘোষণা করছে ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ-

অর্থ ঃ "তোমরা কি কিতাবের এক অংশের প্রতি ঈমান আনছ আর অপর অংশের প্রতি করছ অবিশ্বাস, এরূপ যারা করে তার প্রতিফল এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জিন্দেগীতে হবে তাদের অপমান আর লাঞ্ছনা। এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর আজাবের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৫)

তাই ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পেতে হলে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হতে হবে। আর এ জন্যে দরকার ইসলামী শরীয়াত বা বিধানের পরিপূর্ণ অনুসরণ। ইসলামী সমাজ কায়েম না থাকলে কোন ব্যক্তির পক্ষে ইসলামের এই পরিপূর্ণ অনুসরণ সম্ভব নয়। কাজেই ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ বা ইসলামকে পুরোপুরি মেনে চলার জন্যে প্রয়োজন সমাজ জীবনে ইসলামের বাস্তবায়ন। সমাজে ইসলাম কায়েম থাকলেই ইসলামের অনুসরণ সম্ভব। তাই কুরআনের কিছু মানা আর কিছু না মানা নয় - বরং পরিপূর্ণ কুরআন মেনে চলার মত সমাজ গড়ার নাম ইসলামী বিপ্লব সাধন।

৫. ইসলামী বিপ্লব মানে হুকুমতে ইলাহিয়া বা খিলাফতে ইলাহিয়া কায়েম ঃ হুকুমতে ইলাহিয়া বা খিলাফতে ইলাহিয়ার অর্থ আল্লাহর হুকুম-আহকাম বা আল্লাহর খিলাফত সমাজের মধ্যে পুরোপুরি চালু হওয়া।

আল কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা বিশ্ববাসীকে তাদের কি করণীয় আর কি বর্জনীয় তা পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণা; মানব সমাজে

www.bjilibrary.com

কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুমই চলবে –اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ "আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম চালনো যাবে না।" কুরআন আরো ঘোষণা করছে اَلاَلَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ–। "সাবধান সৃষ্টি যেহেতু তাঁরই (আল্লাহর) হুকুমও চলবে তাঁরই (আল্লাহর)"

তাই, আল্লাহর সৃষ্ট যে সমাজে কেবলমাত্র আল্লাহরই হুকুম চালু রয়েছে, অন্যসব হুকুম হয়েছে আল্লাহর হুকুমের অধীন, সে সমাজে ইসলামী বিপ্লব চালু রয়েছে বলে ধরা যায়।

তেমনিভাবে আল্লাহর খিলাফত কায়েম করেছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) আল কুরআনের ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে তোলেন তা খিলাফতে ইলাহিয়ার আদর্শ নমুনা। এমনিভাবে হুকুমতে ইলাহিয়া বা খিলাফতে ইলাহিয়া কায়েম মানেই ইসলামী বিপ্লব সাধন।

৬. ইসলামী বিপ্লব মানে 'আমর বিল মা'রুফ এবং নেহী আনিল মুনকার' ভালো কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ ঃ

আল কুরআন নির্দেশ দিচ্ছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ–

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একটি দল থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখাবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৪)

বস্তুতঃ সমাজের লোকদের মধ্যে ভালো ও সৎ কাজের প্রচলন এবং অসৎ, খারাপ, অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের দমন ও বন্ধকরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা। ভালো ও সৎ কাজের আদেশ এবং খারাপ ও অসৎ কাজ বন্ধকরণের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় শক্তির। রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমেই এ কাজের আঞ্জাম দেয়ার কথা ঘোষণা করছে আল কুরআন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ–

অর্থ ঃ "তাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো ও সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং খারাপ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৪১)

এমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পক্ষ থেকে ভালো ও সৎ কাজের প্রচলন এবং

www.bjilibrary.com

অসৎ ও খারাপ কাজ বন্ধকরণের কর্মসূচী নিলেই একাজ যথার্থভাবে হতে পারে এবং এ কাজ যথার্থভাবে সম্পন্ন হলেই ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়েছে বলা যায়। বস্তুতঃ ইসলামী বিপ্লবের এটাই কর্মসূচী এবং এর বাস্তবায়নই ইসলামী বিপ্লবের কার্যকর নমুনা।

৭. ইসলামী বিপ্লব মানে বাতিলের পতন ও হকের বিজয় ঃ সমাজে হক ও বাতিলের মধ্যে রয়েছে এক চিরন্তন লড়াই। এ দুনিয়ায় মানুষের বসবাসের সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হক ও বাতিল, সৎ, ও অসৎ, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে এক লড়াই চলছে। এ লড়াই চিরন্তন। এ লড়াই চলবে আবহমানকাল ধরে। এ লড়াইয়ে কখনো হক বিজয়ী হয়, বাতিলের হয় পতন। আবার কখনো বাতিলই জয়লাভ করে, চলে বাতিলের দোর্দন্ড প্রতাপ। তবে সব সময়ই হকের আগমনে বাতিল মিটে যায়। যার ঘোষণা দিচ্ছে আল কুরআন এভাবে ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا-

অর্থ ঃ "সত্য এসে গেছে এবং বাতিল মিটে গেছে। নিশ্চয়ই বাতিল মিটে যাবে।"
(সূরা বনী ইসরাইল ঃ আয়াত ৮১)

মিথ্যা ও বাতিলের যত দাপটই দুনিয়ায় দেখা যাক না কেন তা স্থায়ী নয় বরং হকের বিজয়ই চূড়ান্তভাবে অনিবার্য। হকের উৎস মূল আল্লাহ এবং মিথ্যা ও বাতিলের উৎসমূল শয়তান। তাই চূড়ান্তভাবে বিজয় আল্লাহরই তথা হকেরই। হকের এ বিজয়েরই নাম ইসলামী বিপ্লব।

৮. ইসলামী বিপ্লব মানে সমাজ জীবনে সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি এবং আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী কবুল করানো ঃ আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের জন্য প্রয়োজন শয়তান তথা তাগুতের দাসত্ব বর্জন। আল কুরআন ঘোষণা করছে, তার অনুসারীদের কাজ হচ্ছে ঃ

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

অর্থ ঃ "আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ ও তাগুতের অস্বীকৃতি বা বর্জন।"

অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লব সাধিত হলে সমাজে শয়তানের যে রাজত্ব চলছে তার হবে অবসান এবং সর্বক্ষেত্রে চালু হবে আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক জীবনে, সংস্কৃতি-সভ্যতায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আইন-আদালতে এবং শিক্ষা-প্রশাসন, শাসন-শৃংখলা, যুদ্ধ-সন্ধি, আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তাগুতি বিধানের পরিবর্তে খোদায়ী বিধান চালু হবে আর এভাবে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব কায়েম হবে এবং সাথে সাথে হবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণায় সর্বপ্রকার সার্বভৌম শক্তিকে অস্বীকার করে আল্লাহর চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এভাবে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব ও সার্বভৌমত্ব চালু হলেই বুঝা যাবে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৯. সাধারণ মানুষের ভাষায় ইসলামী বিপ্লব মানে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম বা চালু হওয়া ঃ মানুষের মনগড়া আইন এবং অসৎ, ফাসেক, ফাজের লোকের শাসনই সমাজের সকল অশান্তির মূল কারণ। মানুষ নিজের হাতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী ও বিভাগের জনসমষ্টির জন্য আইন তৈরী করলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। মানুষের পক্ষে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী সময় ও কালের উর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত হওয়া এবং সেইরূপ আইন তৈরী করা বাস্তবে অসম্ভব। তাই ইনসাফের দাবী– গোত্র-কাল ও শ্রেণী নিরপেক্ষ সেই মহাসত্তার তৈরী আইনই কেবলমাত্র মানুষের জন্য উপযুক্ত ভারসাম্যমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও পক্ষপাতমুক্ত। সেই আইনই মানুষকে দিতে পারে শান্তি, স্বস্তি ও মুক্তি।

কিন্তু মানুষের জন্যে আল্লাহর তৈরী সেই আইনের প্রয়োগ করবে কে? যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহর আইনের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখে না, যারা কুরআনের আলোকে তাদের চরিত্র গঠন করে না, যারা যাবতীয় কার্যক্রমে কোন পরোয়া করে না আল্লাহর আইনের - সেই ধরনের অসৎ, ফাসেক, ফাজের ও বেঈমান ব্যক্তিদের দ্বারা কি আল্লাহর আইন কার্যকর হওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত? কিছুতেই নয় বরং আল্লাহর আইন চালু করার জন্য দরকার আল্লাহর আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দক্ষ, সৎ ও যোগ্য লোকদের এমন একটি দল যারা আল্লাহর আইন তথা আল কুরআনের প্রতি রাখে মজবুত ঈমান ও গভীর আস্থা, যারা তাদের চরিত্রকে গড়ে তোলে আল কুরআনের আলোকে এবং তাদের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে আল কুরআনের শিক্ষার ভিত্তিতে।

তাই সমাজের কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রয়োজন সমাজের মধ্যে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের বাস্তবায়ন। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের এই বাস্তবায়নেরই নাম ইসলামী বিপ্লব।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতিসহ আমরা ইসলামী বিপ্লব বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করলাম। এখান থেকে আমরা যা পেলাম তার সার-সংক্ষেপ হলো, ইসলামী বিপ্লব মানে –

১. ইকামাতে দ্বীন।
২. অন্যসব দ্বীনের উপর দ্বীনে হকের বিজয়।
৩. ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি দাখিল হওয়া।
৪. হুকুমতে ইলাহিয়া বা খেলাফতে ইলাহিয়া কায়েম।
৫. আমর বিল মা'রুফ ও নেহী আনিল মুনকার (ভালো কাজের নির্দেশ ও খারাপ কাজ থেকে বিরতকরণ)
৬. বাতিলের পতন ও হকের বিজয়।
৭. আল্লাহর দাসত্ব ও সার্বভৌমত্ব গ্রহণ ও তাগুতের দাসত্ব বর্জন।
৮. আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম।

www.bjilibrary.com

এ আলোচনা এ ধারণা পেশ করে - আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর আইন, তার হুকুমত বা খেলাখত, দ্বীনে হক্কের বিজয়, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা দাসত্ব এবং সৎ লোকের শাসন-এর প্রত্যেকটির মোকাবেলায় একটি প্রতিপক্ষ ও একটি বিরোধী শক্তি রয়েছে। এর যে কোনটি ময়দানে সক্রিয় ও তৎপর হয়ে উঠলে সাথে সাথে বিরোধী শক্তিটিও মোকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে। অথবা পূর্ব থেকেই বিরোধী শক্তি এর পথ রোধ করে বসে আছে।

যেমন একামতে দ্বীনের কাজে এগিয়ে আসলে পূর্ব থেকে ক্ষমতাসীন স্বার্থ চক্র তার পথ রোধ করে দাঁড়াবে, দ্বীনে হককে বিজয়ী করতে এগিয়ে গেলে অন্যসব চালু দ্বীন তাতে বাধ সাধবে, পুরোপুরি ইসলাম মানার ক্ষেত্রে ফাসেকী, ফাজেরী তা হতে দেবে না, হুকুমতে ইলাহিয়া বা খেলাফতে ইলাহিয়ার বদলে শয়তানের শাসন-খেলাফত সামনে এসে দাঁড়াবে, আমর বিল মা'রুফ ও নেহী আনিল মুনকারের পরিবর্তে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা ঠিক তার উল্টো কাজে নিয়োজিত হবে, হকের বিজয়ের মোকাবেলায় বাতিলের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান, আল্লাহর দাসত্ব ও সার্বভৌমত্বের মোকাবেলায় তাগুতের দাসত্বে দোর্দন্ড প্রতাপ, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের মোকাবেলায় মানুষের মনগড়া আইনে নিমজ্জিত অসৎ, ফাসেক, ফাজেরদের কুটিল ও সংঘবদ্ধ শক্তি। তাই ইসলামী বিপ্লবের জন্য কাজ করা মানে একটি প্রতিপক্ষ-বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করে কামিয়াবী অর্জন। এ কোন সহজ কাজ নয়। এ এক কঠিন, মারাত্মক ও বিপদসঙ্কুল কাজের ফায়সালা। এ ধরনের ইসলামী বিপ্লবের জন্য আল কুরআনের ভাষায় আল্লাহর পথে লড়াইরত একটি দলের প্রয়োজন ঃ

فِئَةٌ تُقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

অর্থ ঃ "একটি দল যা আল্লাহর পথে লড়াই করছে।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩)

এ দলটি তাগুত ও বাতিলের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলোর পতন ঘটিয়ে বিজয়ের রাজটিকা ছিনিয়ে নেয়ার শক্তি ও হিম্মত নিয়েই মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে। কাজেই এ দলের নেতা ও কর্মীদেরকে কঠিন ফায়সালা নিয়েই মাঠে নামতে হবে এবং তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সমাবেশও থাকতে হবে, দলটিকে অবশ্য হতে হবে সুসংগঠিত। কারণ, স্পষ্টভাবে একথা মনে রাখতে হবে - ইসলামী বিপ্লব কোন যাদুর কাঠি নয়, নয় কোন আবেগ-উচ্ছ্বাসের ফলাফল। লাখো -কোটি মানুষের নিকট সুললিত কণ্ঠে ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের কারণে ইসলামী বিপ্লব ঘটে যাবে না, সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপক দাওয়া এবং সমাজ সেবা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলেও তা সংগঠিত হবে না। বাতিলের প্রতিরোধের কঠিন মোকাবেলা করে বাতিলকে মিটিয়ে দিয়েই কেবলমাত্র হকের বিজয় তথা ইসলামী বিপ্লব সম্ভব।

www.bjilibrary.com

তাহলে ইসলামী বিপ্লব বলতে আমরা যা বুঝলাম তা হলো পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপ্ত জীবন-বিধান। ইসলামকে সমাজে পুরোপুরিভাবে কায়েম করার লক্ষ্যে তাগুতি ও বাতিল কায়েমী স্বার্থের প্রচন্ড শক্তির মোকাবেলা করে বাতিল শক্তিকে পরাজিত করে, মিটিয়ে দিয়ে ইসলামী শক্তির বিজয় সাধনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুসংগঠিত দলের, একটি সংগঠনের।

ইসলামী বিপ্লব কেন?

এ দুনিয়ায় কোটি কোটি মানুষের বাস। এরা শান্তি চায়, নিরাপত্তা চায়। পৃথিবীর বুকে আজ পর্যন্ত বহু আদর্শ ও মতবাদের পরীক্ষা- নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু কোন আদর্শই মানুষকে তার কাম্যবস্তু দিতে পারেনি। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি দান করেছে। কিন্তু দিতে পারেনি মানব সমাজে শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপত্তা। তাই দেখা যায় ধনাঢ্য দেশ আমেরিকায় ব্যক্তি-জীবনে হতাশা, পারিবারিক জীবনে অশান্তি, সমাজ জীবনে বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি। ঘুণে ধরা পুঁজিবাদী সমাজ আজ ক্ষয়িষ্ণু। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ তো ইতিমধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। তাগুতি শক্তির জরাজীর্ণ কলা কৌশল বিশ্ব মানবতাকে শান্তি দিতে পারে না - এটা আজ এক পরীক্ষিত সত্য। আজকের এবং অনাগত কালের বিশ্ব মানবতার জন্য বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ভারসাম্যপূর্ণ এক জীবন-বিধানই মুক্তির একমাত্র পথ। আর সেই জীবন-বিধানই খোদা প্রদত্ত জীবন-বিধান আল-ইসলাম। কিন্তু তাগুতি শক্তির কলা-কৌশল তো আজো অকেজো হয়ে পড়েনি। তাই তা তার সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামী শক্তিকে রুখে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। এহেন অবস্থায় ইসলামী শক্তি ও তাগুতি শক্তির মধ্যে এক প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী। তাই আজকের সময়ের দাবী তাগুতি শক্তিকে নির্মূল করে ইসলামী শক্তির উত্থানের এক সর্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজ আজকে আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষাকে ভুলে পথভ্রষ্ট, দিশেহারা। আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর একামতে দ্বীনের যে বিরাট দায়িত্ব ছিল যা যুগে যুগে নবী রাসূলগণ পালন করে গেছেন, আজকের মুসলিম সমাজ সেই সর্বপ্রধান ফরজ কাজটিকে ভুলে গেছে। আর ফলস্বরূপ মুসলিম সমাজে এসেছে অধঃপতন, গোমরাহী ও নানা ধরনের অনৈসলামিক কার্যকলাপ। মুসলিম সমাজ যদি তার হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যি সেই প্রধান কাজটি - একামতে দ্বীনের দায়িত্ব-পালনে তৎপর হতে হবে। সেই একামতে দ্বীনের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সাধনে সক্ষম হলেই মুসলিম সমাজের যথার্থ দায়িত্ব পালিত হবে।

আমাদের প্রিয় নবী দ্বীনে হক্ক তথা ইসলামের বিজয়ের যে পয়গাম নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং যথার্থভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে গিয়েছিলেন, সেই নবীর উম্মত হিসেবে ইসলামের বিজয়ের জন্যে কোন কর্মসূচী নিয়ে কাজ করলেই

www.bjilibrary.com

কেবলমাত্র দায়িত্ব পালন হতে পারে। একাজের কোন বিকল্প নেই। অন্য সকল দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় দান তথা ইসলামী বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই উম্মতের সে দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব।

ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হওয়ার যে নির্দেশ রয়েছে কুরআন পাকে, তাকে কার্যকর করতে হলে এক সর্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন প্রয়োজন। ইসলামী বিপ্লবের এক সর্বগ্রাসী সয়লাবই যাবতীয় ফাসেকী, শেরেকী ও কুফুরী কার্যকলাপকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কেবলমাত্র একটি সফল ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভব হুকুমতে ইলাহিয়া বা খেলাফতে ইলাহিয়া কায়েম। যতদিন না পুরোপুরিভাবে আল্লাহর হুকুমাত বা খেলাফত এই মানব সমাজে কায়েম হবে, ততদিন মানুষের অন্তহীন সমস্যার সমাধান হবে না। তাই সকল সমস্যার সমাধান ইসলামী বিপ্লবে। সমাজে অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সকল মুনকার -খারাপ, অশ্লীল ও জঘন্য কার্যকলাপের অপসারণ-প্রতিরোধ এবং মারুফ-ভালো কল্যাণকর কাজের প্রসার ও প্রচলন। ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠাই তার একমাত্র উপায়।

এভাবে ইসলামী বিপ্লবের ফলে যদি বাতিলের মূলোৎপাটন করা যায়, হক যদি বিজয় লাভ করে, তাহলেই কেবল মানুষের কল্যাণকামী একটি সমাজ কায়েম হবে, তাগুতি শক্তি হবে কোনঠাসা, মানবতা লাভ করবে তার প্রকৃত মর্যাদা। তখনই চালু হবে আল্লাহর আইন, কায়েম হবে সৎ, যোগ্য ও ঈমানদার লোকের শাসন। তাই সকল কিছুর একমাত্র প্রতিকার একটি সফল ইসলামী বিপ্লব।

ইসলামী বিপ্লবহীন আজকের মুসলিম সমাজ দুনিয়ার বুকে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, আখেরাতে তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন। এ দুঃসহ পরিণতি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় একটি নির্ভেজাল ইসলামী বিপ্লব।

ইসলামী বিপ্লব কিভাবে?

ইসলামী বিপ্লব কি ও কেন - একথা কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করা যত সহজ, ইসলামী বিপ্লব বাস্তবে ঘটানো তত সহজ কোন কাজ নয়। তাই কিভাবে একটি মুসলিম সমাজে ইসলামী বিপ্লব ঘটানো যায় তা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এ প্রসংগে বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের অগ্রনায়ক ও পথিকৃত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) তাঁর "ইসলামী বিপ্লবের পথ" বইয়ে যা লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ

"ইসলামী রাষ্ট্রও কোন অলৌকিক ঘটনায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সে জন্য গোড়া হইতেই ইসলামের বিশিষ্ট জীবন দর্শন ও পদ্ধতি এবং ইসলামী চরিত্র ও স্বভাব প্রকৃতির বিশেষ মাপকাঠি অনুযায়ী গঠিত একটি বিরাট ও ব্যাপক

www.bjilibrary.com

আন্দোলন সৃষ্টি অপরিহার্য। সে আন্দোলনের নেতা, পুরোধা ও কর্মী হইবেন এমন লোক, যাহারা মানবতার এই বিশিষ্ট আদর্শে আত্মগঠন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। অতঃপর তাহারা সমস্ত সমাজ-মনে অনুরূপ মনোভাব ও নৈতিক অনুপ্রেরণা জাগ্রত করিতে সর্বশক্তি প্রয়োগে সচেষ্ট থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত ইসলামের উল্লিখিত পদ্ধতির ভিত্তিতে এক অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করাও আবশ্যক যাহা সঠিক ইসলামী আদর্শে নাগরিকদের জীবন গঠন করিবে এবং মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম আইনজ্ঞ, মুসলিম রাষ্ট্র নায়ক - এক কথায় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় খাঁটি ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে চিন্তা ও কাজ করিতে সক্ষম লোক গড়িয়া তুলিবে। তাহাদের মধ্যে খালেছ ইসলামের আদর্শে চিন্তা ও মতবাদের এক পূর্ণ ব্যবস্থা এবং কর্ম জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা রচনার সামর্থ বর্তমান থাকা চাই, যে শক্তি দ্বারা তাঁহারা দুনিয়ার আল্লাদ্রোহী চিন্তানায়কদের বিরুদ্ধে নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন।

বুদ্ধি ও মননশক্তি এই বিপ্লবী পটভূমির ভিত্তিতে এহেন ইসলামী আন্দোলন চারিদিকের যাবতীয় অবাঞ্ছিত জীবন ধারার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম করিবে। সেই সংগ্রামে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, নির্যাতন ও নিষ্পেষণ অকাতরে সহ্য করিয়া, আত্মদান করিয়া, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াও তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আকাঙ্খার তীব্রতা ও আদর্শের দৃঢ়তা প্রমাণ করিবেন। পরীক্ষার অগ্নিদহন সহ্য করিয়া তাঁহারা এমন নিখাদ স্বর্ণে পরিণত হইবেন যে, যে কোন পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াও তাঁহাদের ভিতর হইতে এতটুকু খাদ বাহির করা সম্ভব হইবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় নিজেদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ দ্বারাই তাঁহারা নিজেদের সেই আদর্শবাদিতার বাস্তব প্রমাণ পেশ করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথায়ই দুনিয়ার মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, এইসব নিঃস্বার্থ, নিষ্কলুষ, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, মানবতার কল্যাণের জন্যে যে আদর্শবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানাইতেছেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে নিখিল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ, সুবিচার ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নিহিত রহিয়াছে। এইরূপ ধারাবাহিক ও অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া গেলে সমাজের যেসব লোকের প্রকৃতিতে ন্যায় ও সত্যের উপাদান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, সকলেই ধীরে ধীরে এই আন্দোলনে যোগদান করিবে। পক্ষান্তরে হীন প্রকৃতির দুর্বলচেতা ও নীচমনা লোকদের প্রভাব সমাজ হইতে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইবে। ইহার ফলে জনগণের মনোজগতে এক প্রচন্ড বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে। সমাজ-মনে সেই বিশেষ ধরনের আদর্শবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দাবী যেমন জাগিয়া উঠিবে, উহার প্রয়োজনবোধ ও চাহিদাও অনুরূপভাবে বাড়িয়া যাইবে। সমগ্রভাবে গোটা সমাজের অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতীত অন্যবিধ ব্যবস্থা দানা বাধিবার অবকাশ পাইবে না। সর্বশেষে স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী রূপে সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই কায়েম হইবে, যাহার জন্য এতদিন ধরিয়া অক্লান্ত চেষ্টায় অনুকূল

www.bjilibrary.com

পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাবে উহা পরিচালনার জন্য নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া উযীর ও শাসনকর্তা পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মকর্তা প্রস্তুত হইবে। কোন দিকে রাষ্ট্রের কোন বিভাগেই কর্মকর্তার অভাব হেতু কাজ বন্ধ হওয়ার আশংকা থাকিবে না।

বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইহাই হইতেছে একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা - ইহাকেই বলা হয় ইসলামী ইনকিলাব।"

(ইসলামী বিপ্লবের পথ - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী পৃ ঃ ১৭-১৯)

তিনি আরও বলেন, "ইসলামী বিপ্লবও তখনই সৃষ্টি হইবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে যখন কুরআনের আদর্শ ও মতবাদ এবং নবী মোস্তফার (সাঃ) চরিত্র ও কার্যকলাপের বুনিয়াদে কোন গণ-আন্দোলন জাগিয়া উঠিবে আর সমাজ জীবনের সমগ্র মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদকে একটি প্রবলতর সংগ্রামের সাহায্যে একেবারে আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলা সম্ভব হইবে।" - (ইসলামী বিপ্লবের পথ)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা যে বিষয়গুলো পাই তা হলো ঃ

১. ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্রবান নেতা ও কর্মীর সমন্বয়ে একটি গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে।
২. ইসলামী শিক্ষার প্রচলনের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত যুবকদের গড়ে তুলতে হবে।
৩. এভাবে খোদাদ্রোহী চিন্তানায়ক ও ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হবে।
৪. সে সংগ্রামে আন্দোলনের নেতা ও কর্মীগণ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হবেন এবং নিঃস্বার্থতা প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন।
৫. এভাবে ধারাবাহিক ও অবিরাম সংগ্রামের ফলে সমাজের ন্যায় ও সত্যপন্থী লোকেরা তাদের আন্দোলনে যোগ দিবে এবং হীন চরিত্রের লোকেরা দুর্বল হয়ে পড়বে।
৬. পরিণতিতে জনগণের মনোজগতে এক প্রচন্ড বিপ্লবের সৃষ্টি হবে এবং ইসলামী বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও দাবী সৃষ্টি হবে।
৭. সর্বশেষে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হবে।

এ থেকে দেখা গেলো, ইসলামী বিপ্লবের সম্পর্ক ইসলামী আন্দোলনের নেতা, কর্মী ও সাধারণ জনগণের সাথে। নেতা ও কর্মী যথার্থ ভূমিকা এবং জনগণের গণ-আন্দোলনই পরিণতিতে ইসলামী বিপ্লব সাধন করবে। এ পর্যায়ে আধুনিক বিশ্বে ইসলামী বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলো আলোচনার দাবী রাখে।

www.bjilibrary.com

ইসলামী বিপ্লবের পূর্বশর্ত ঃ

ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য জনগণের পক্ষ থেকে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের দাবী, বিরোধী শক্তির মোকাবেলা, আদর্শ মাফিক রাষ্ট্র গঠনের উপযোগী লোক তৈরী, বিশ্ব জনমতের সমর্থন - এসব কাজগুলো হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে হবে এগুলো? এগুলো কি অটোমেটিক-স্বাভাবিকভাবেই হবে? না এর পিছনে কোন শক্তির ভূমিকা দরকার?

আম্বিয়ায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাস থেকে দু'টো জিনিসের সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেখা যায়। ১. বিপ্লবের একজন আহবায়ক ২. বিপ্লব পরিচালনার জন্য একটি সংগঠন।

১. আহবায়কের ভূমিকা ঃ

যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কিরাম ইসলামী বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে দুনিয়ায় এসেছেন। প্রত্যেক নবী-ই মূলতঃ আহবানকারীর ভূমিকা পালন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ায় আত্মভোলা মানুষকে তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়াই তো নবীর কাজ। তাই নবী সমাজের মানুষকে ডাক দিয়েছেন আল্লাহর দাসত্বের দিকেঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ-

"হে আমার কওম, তোমরা কেবল আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ কর, কেননা তোমাদের জন্য অন্য কোন ইলাহ তো নেই।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫৯)

এভাবেই সে আহবায়ক সমাজের গোমরাহীর বিষয়গুলো জাতির সামনে তুলে ধরে তা থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছেন।

নবী করিম (সাঃ)-কে আহবায়কের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। পরবর্তী যুগেও যে ব্যক্তিই অনুধাবন করেছেন যে, ইসলাম মোতাবেক একটি সমাজ গড়ে তোলা দরকার তাকেই আহবানকারীর ভূমিকায় নামতে হয়েছে। ইসলামী বিপ্লবে এই দা'য়ী ইলাল্লাহ - আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ভূমিকা মুখ্য। আজো কোন এলাকায়, কোন দেশে ইসলামী বিপ্লবের কাজের সূচনা করতে হলে ঐ এলাকায় একজন আহবানকারীকেই প্রথমে একাজে এগিয়ে আসতে হয়।

২. সংগঠন ঃ

আহবায়ক যে ডাক দেয়, সে ডাকে যদি কিছু লোক সাড়া দেয়, তাহলে আহবায়ক তাদেরকে নিয়ে গড়ে তোলে একটি সংগঠন। ইসলামী বিপ্লবের পথে এমন একটি সংগঠন গড়ে উঠলে বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্য হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। আম্বিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে কোন কোন নবী একটি ভালো সংগঠন গড়ে তোলার মত লোক সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। ফলে তাদের পক্ষে বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। সেসব সমাজে ইসলামী বিপ্লবও

www.bjilibrary.com

সাধিত হয়নি। তাই ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্যে সংগঠন একটি অপরিহার্য শর্ত। প্রকৃতপক্ষে সংগঠনই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামী বিপ্লব সাধনের পথে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামী বিপ্লবের পথে বাকী সকল কাজকর্ম সম্পাদনে সংগঠনের ভূমিকাই মুখ্য। সংগঠনই আদর্শের প্রচার ও দাওয়াত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেয়, জনগণকে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে, গণ-বিপ্লব সৃষ্টি করে। বিরোধী শক্তির মোকাবেলাকরণে সংগঠনেরই পদক্ষেপ নিতে হয়। সংগঠনই বিপ্লবকে ধরে রাখার জন্যে লোক তৈরী করে, জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইসলামী বিপ্লব সাধনের পরও সংগঠনই বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করে। বস্তুতঃ যে ক্ষেত্রে আহবায়ক বিপ্লবের পথে একটি মজবুত ও সফল সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন, সে ক্ষেত্রেই বিপ্লব সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। ইসলামী বিপ্লবও তেমনি সাফল্য লাভ করে একটি সফল ও মজবুত সংগঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমেই।

৩. সক্রিয় জনমত ঃ

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে তৃতীয় যে অপরিহার্য শর্ত তা হলো সক্রিয় জনমত। ইসলামী বিপ্লব জনগণকে নিয়েই। তাই জনগণের চাহিদার মাধ্যমেই ইসলামী বিপ্লব সাধিত হবে। আদর্শিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যখন প্রমাণিত হবে যে, ইসলাম ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নেই, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের ত্যাগ, কুরবানী, জন-কল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিঃস্বার্থ ও নিরলস জনসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের নিকট যখন একথা পরিষ্কার হবে যে, ইসলামী আন্দোলন জনগণেরই মুক্তির জন্যে, তখন জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবেই ইসলামী বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসবে, বরং জনগণই ইসলামী বিপ্লবের দাবী জানাবে। এভাবে কোন একটি দেশে ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে সক্রিয় জনমত সৃষ্টি হলেই বিপ্লবের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জিত হবে।

ইসলামী বিপ্লব কোনো চোরা পথে, রাতের অন্ধকারে, গোপনে গোপনে আসে না, সন্ত্রাসী তৎপরতা ও বন্দুকের নলের মাধ্যমেও সত্যিকার ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয় না। ইসলামী বিপ্লব আসে বিপ্লবের রাজপথে, জনতার উদ্বেলিত শ্লোগানের মধ্য দিয়ে। সংগঠনের পরিকল্পনা মোতাবেক ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত দেশবাসী তথা দুনিয়াবাসীর নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে, যার স্বাভাবিক পরিণতিতে সমাজে ইসলামী আদর্শের স্বীকৃতি ঘটবে। কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের নিকট ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরতে হবে। কুরআন-হাদীসের তাফসীর, আলোচনা, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার দাওয়াতী পন্থা অবলম্বন করে ইসলামের দাওয়াত ও মর্মবাণীকে সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গণসংযোগের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে দেশব্যাপী একটি

www.bjilibrary.com

অনুকূল জনমত গড়ে তুলতে হবে। এভাবে ইসলামের বাস্তবায়নকামী জনতাকে একটি সংগঠিত জনশক্তিতে এবং গোটা দেশবাসীকে ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে একটি সক্রিয় জনমতে তৈরী করতে পারলেই ইসলামী বিপ্লবের কাজ তরান্বিত হবে।

৪. ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের একটি জোরালো আন্দোলন ঃ

একটি সক্রিয় জনমত গড়ে তোলার পূর্বে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে আরো দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় রয়েছে। আহবায়কের আহবান, সংগঠনের গোড়াপত্তন, জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা - এগুলোর জন্যে একটি জোরালো ও স্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ হলো সেই কাজ, যে কাজের কথা আল কুরআনে –جِهَادٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰه "বা আল্লাহর পথে জিহাদ" শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে। মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

تُجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

অর্থ ঃ "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর তোমাদের জান ও মাল দিয়ে - এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে।" (সূরা সফ ঃ আয়াত ১১)

এ পর্যায়ে বিরোধীদের সাথে হবে মোকাবেলা। প্রথম পর্যায়ে মুমিনদের উপর আসবে আঘাত, আসবে নির্যাতন, তাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়া হবে, আল্লাহর পথে অশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হবে। আসবে জেল-যুলুম, জরিমানা, শাহাদাত। হয়রানী, পেরেশানীর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে মুমিনগণ।

তবুও আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে হবে হিযরত, নজীরবিহীন ত্যাগ কুরবানী। বাতিল শক্তির সাথে হবে মোকাবেলা। এভাবে চলবে আল্লাহর পথে জিহাদ। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর এই দুর্গম পথ বেয়েই আসবে ইসলামী বিপ্লব।

৫. মান মোতাবেক যথেষ্ট পরিমাণ লোক তৈরী ঃ

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আন্দোলন পরিচালনা, জনগণকে সংগঠিতকরণ, বিরোধী শক্তির মোকাবেলাকরণ, বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় প্রতিরোধ সৃষ্টি ও ইসলামী বিপ্লব ধারণ করার জন্য মান মোতাবেক যথেষ্ট পরিমাণ লোক তৈরী। ইসলামী আদর্শের সত্যিকার স্পিরিট অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদা মোতাবেক এসব লোক তৈরী করতে হবে। এদের মধ্যে থাকবে নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্ব। কেন্দ্র থেকে সর্বনিম্ন ইউনিট পর্যন্ত নেতৃত্বের চেইন সৃষ্টি হবে। কর্মীদের মধ্যে থাকবে সদা তৎপর, ত্যাগী, ছবর, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর গুণসম্পন্ন এক মজবুত ও বিরাট কর্মীবাহিনী। এরা ইসলামী জ্ঞানে হবে পারদর্শী, বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও বাস্তবমুখী কাজে সুদক্ষ, সদাজাগ্রত ও নিবেদিত প্রাণ। সর্বোপরি ইসলামের

www.bjilibrary.com

বাস্তবায়নকামী এই জনশক্তিকে তাদের জান ও মাল দিয়ে ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

লোক তৈরীর এক স্থায়ী প্রোগ্রাম সংগঠনের মধ্যেই থাকতে হবে। ইসলামী বিপ্লবের জন্যে তৈরী লোক বিদেশ থেকে আমদানী করা যাবে না বা রেডিমেড এরূপ লোকও পাওয়া যাবে না। তাই কুরআন-হাদীসের চর্চা, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিরোধী শক্তির অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করা এবং মোকাবেলা ইত্যাকার কর্মসূচীর মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের খাঁটি কর্মী তৈরী করতে হবে। এভাবে কর্মীদের ঈমানী, এলমী ও আমলী যোগ্যতা বাড়াতে হবে। ঈমানের মজবুতি, এলেমের গভীরতা ও আমলের নির্মলতার মাধ্যমে উন্নতমানের কর্মী সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি আন্দোলনের প্রয়োজনে কর্মীদের জান ও মাল বিলিয়ে দেবার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

৬. বলিষ্ঠ, সাহসী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্ব ঃ

যে কোন বিপ্লবের জন্যে যোগ্যতাসম্পন্ন সাহসী নেতৃত্বের প্রয়োজন। যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্ব ব্যতীত দুনিয়াতে কোন দিন কোন বিপ্লব সংগঠিত হয়নি। ইসলামী বিপ্লবের জন্যে আদর্শমাফিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। আসলে ইসলামী বিপ্লবের কাজটি হলো আম্বিয়ায়ে কিরামের কাজ। তাই নবীর অবর্তমানে সেই মানেরই নেতৃত্বের প্রয়োজন। তাকে নবীর মতই বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে, নিষ্কলুষ ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে হতে হবে উন্নত, আচার-ব্যবহারে হতে হবে ভদ্র ও বিনয়ী। হতে হবে প্রিয়ভাষী, নীতির অনুসরণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে হতে হবে দৃঢ় ও মজবুত।

৭. ত্যাগী ও সদাতৎপর কর্মীবাহিনী ঃ

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন সদাতৎপর একটি কর্মীবাহিনী। মৌসুমী কর্মীদের দ্বারা ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয়। তাদেরকে ত্যাগ ও কুরবানীতে সাহাবায়ে কিরামের অনুসারী হতে হবে। ইসলামী জ্ঞানার্জন ও শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে অনুরাগী হতে হবে। সাফল্যের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত গুণাবলী অর্জন করতে হবে। তাদেরকে স্বত:স্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে আন্দোলনের পথে। তারা হযরত মুসা (আঃ)-এর উম্মতের মত নেতার অসহযোগী হবে না বরং আন্দোলনের দাবী অনুযায়ী যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম হবেন তাদের সামনে উত্তম উদাহরণ।

৮. প্রতিরোধ শক্তি অর্জন ঃ

এ পর্যায়ে সংগঠনকে এমন একটি প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করতে হবে যাতে হামলা, আঘাত, হয়রানী, পেরেশানী যাই ঘটুক না কেন সংগঠন যেন তার মূল শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ইসলামী আন্দোলনের পথে কায়েমী স্বার্থবাদী বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে আঘাত আসবে চিরন্তন নীতি অনুযায়ীই। কিন্তু

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনকে বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে এ পরিমাণ সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে এবং এ পরিমাণ সক্রিয় জনমত গড়ে তুলতে হবে যাতে এমন একটি গণভিত্তি রচিত হবে, যা যে কোন আঘাতকে প্রতিরোধ করার শক্তি রাখে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মদীনায় ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার পরও বদর, ওহুদ, খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এমনিভাবে ইসলামী বিপ্লব সাধন পর্যায়ে এবং বিপ্লবের পর প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন ও ইসলামী রাষ্ট্রকে হেফাজত করার জন্যে সংগঠনকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে পূর্ণ হেকমতের সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯. ধারণ ক্ষমতা লাভ ঃ

প্রতিরোধ ক্ষমতার ন্যায় ইসলামী বিপ্লবের জন্যে ধারণ ক্ষমতা অর্জনও জরুরী। ধারণ ক্ষমতা প্রয়োজন ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর তাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিপ্লব একটি বিরাট পদক্ষেপ। আধুনিক রাষ্ট্রের যতগুলো বিভাগ আছে সবগুলো বিভাগে আন্দোলনের তৈরী লোক দ্বারা আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর রেডিমেড লোক দ্বারা এ বিরাট কাজ সম্ভব নয়। তাই আন্দোলনের পর্যায় থেকেই বিভিন্ন বিভাগে এ কাজ শুরু করে দিতে হবে। ঐ বিভাগকে ইসলামী ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি গ্রুপ তৈরী করতে হবে এবং বিপ্লবের পর যোগ্যতার সাথে কর্ম সম্পাদনের প্রস্তুতি নিতে হবে। এভাবে বিপ্লবের পূর্বেই প্রধান প্রধান সকল বিভাগে কাজ শুরু করে দিতে হবে, যাতে বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর যোগ্যতার সাথে ঐ সব বিভাগে পরিবর্তন এনে প্রকৃত বিপ্লব ঘটানো যায়।

১০. উপসংহার ঃ

ইসলামী বিপ্লব কি, কেন এবং কিভাবে আলোচনার পর ইসলামী বিপ্লবের জন্যে শর্তাবলী আলোচনা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পেলাম ঃ

- ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনই ইসলামী বিপ্লব;
- আজকের বিশ্বমানবতার জন্যে ইসলামী বিপ্লব একটি অপরিহার্য প্রয়োজন;
- ইসলামী বিপ্লব এক আহবায়কের আহবানে সংগঠনের মাধ্যমে সক্রিয় জনমতের ভিত্তিতে এক সফল ইসলামী আন্দোলন;
- ইসলামী বিপ্লবের জন্যে গঠিত সংগঠনই বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি, তাই ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটি মজবুত সংগঠনের।

www.bjilibrary.com

ইসলাম ও সংগঠন

ইসলাম একটি ধর্ম, একটি আদর্শ, একটি জীবন-বিধান। ইসলামের অনুসারীরা মুসলমান নামে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। মুসলমানদের ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন এবং তাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ)। আল-কুরআন ও নবীর শিক্ষানুযায়ী মুসলমানগণ একটি সংগঠনভুক্ত উম্মত। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে সংগঠনের গুরুত্ব কতটুকু, ইসলামের সাথে সংগঠনের সম্পর্ক কি, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক, ইসলামী আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট কি কি – এসব বিষয়ই এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এ আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করাই উদ্দেশ্য।

ইসলামী আদর্শ ও সংগঠন ঃ

১. ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ যেমন আত্মসমর্পণ, পারিভাষিক অর্থেও ইসলাম মানে আল্লাহর নিকট বান্দার আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ অর্থ আনুগত্য স্বীকার ও অনুগত হওয়া। ইসলামও তা দাবী করে ঃ

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ-

অর্থ ঃ "আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের।"

(সূরা আত তাগাবুন ঃ আয়াত ১২)

ইসলামের অর্থ যেমন আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার, সংগঠনের ভিত্তিও তেমনি আনুগত্য অর্থাৎ নির্দেশ প্রদান ও নির্দেশ মানা। সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী ব্যতীত বাকী তিনটি উপাদান– একক উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও তহবিল-জনশক্তির কাজের ফলাফল। তাই সংগঠনের মূল ভিত্তি হলো নেতৃত্ব ও তার অনুসারীবৃন্দ অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিরাজিত আনুগত্য। সংগঠনের এই আনুগত্য মানে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহকে মেনে চলার ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া বিধান সমাজে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নেতৃত্বের আনুগত্য।

এ ব্যাপারে নবী রাসূলগণ সমাজের লোকদের নিকট যে জিনিষ দাবী করেছেন তা হলো ঃ

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ-

www.bjilibrary.com

অর্থ ঃ "অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।"
(সূরা শু'আরা ঃ আয়াত ১৫০)

তাই দেখা যায় ইসলাম মানে নবীর আনুগত্য, সংগঠন মানেও তাই। উম্মত যখন নবীর আনুগত্য করে তখনই তা হয় সংগঠন এবং তা যথার্থ অর্থে ইসলামও বটে।

আল্লাহ তায়ালা নিজে বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে নবীর কথা যথার্থভাবে শুনে তার আনুগত্য করতে বলেছেন ঃ

وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا–

অর্থ ঃ "এবং শুন যথার্থভাবে ও মান্য কর।" (সূরা আত-তাগাবুন ঃ আয়াত ১৬)

সাহাবায়ে কিরামের মুখ থেকে ঘোষণা এসেছে ঃ

অর্থ ঃ "আমরা শুনলাম ও মানলাম।" سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا–

এভাবে ইসলামের প্রকৃত অর্থ হলো নবীর আনুগত্য। আর উম্মত যদি নবীর আনুগত্য করে চলে এবং পরবর্তীতে অনুসারী দল যদি নেতৃত্বের আনুগত্য করে চলে তবে তাই হলো যথার্থ অর্থে সংগঠন। তাই যথাযথভাবেই বলা যায় ইসলাম নিজেই একটি সংগঠন।

২. আল্লাহতায়ালা কুরআন পাকে নবীকে ব্যক্তি হিসেবে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু জাতিগতভাবে প্রধানতঃ সম্বোধন করা হয়েছে এইভাবে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا – يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا –

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ এবং হে কাফিরবৃন্দ" অর্থাৎ আল্লাহর দৃষ্টিতে দুনিয়াতে দুইটি দল- মুমিন ও কাফির। যা আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে সূরা নিসায় ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ–

অর্থ ঃ "যারা মুমিন তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে, যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭৬)

অর্থাৎ দু'টি দল নিজ নিজ পক্ষাবলম্বন করে লড়াই করে – তাই তারা দু'টি বাহিনী। যারা যত বেশী সংগঠিত, সাধারণতঃ তাদেরই বিজয়ী হবার কথা। অবশ্য আল্লাহর ফয়সালাই চূড়ান্ত। উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝা গেল যে, মুমিনগণ সু-সংগঠিত একটি দল।

৩. আল-কুরআনে মুসলমানদেরকে একটি উম্মত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

(الف) كَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا–

www.bjilibrary.com

অর্থ ঃ ক. এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি।
(সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৩)

(ب) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ-

খ. তোমাদের মধ্যে অবশ্যি একটি দল থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৪)

(ت) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ-

গ. তোমরা হলে উত্তম জাতি (দল) গোটা মানবজাতির কল্যাণে তোমাদের উত্থান। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১১০)

এভাবে মুসলমানগণ একটি দল, দলবদ্ধভাবেই তাদের অবস্থান। নবীর অবর্তমানে মুসলমানগণ তাদের নেতা নির্বাচন করে দলবদ্ধভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে এটাই কুরআনের দাবী। তাই মুসলমানগণ একটি সু-সংগঠিত উম্মত।

৪. আল-কুরআন মুসলমানদেরকে সু-সংগঠিত হবার নির্দেশ দিচ্ছে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا-

অর্থ ঃ "তোমরা সকলে মিলে সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রশিকে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৩)

কুরআন বরং আরো অগ্রসর হয়ে বলছে যারা আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহের ভিতর প্রবেশ করে এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ করে ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا-

অর্থ ঃ "যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং সেই ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হয়, তাদেরকে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের ভিতর দাখিল করানো হবে এবং তাদেরকে (তারই প্রতি) সিরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়াত দেয়া হবে।"
(সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৭৫)

লক্ষ্য করার ব্যাপার; ঈমানের সাথে সংঘবদ্ধতা যুক্ত হলে আল্লাহর নিকট থেকে রহমত, অনুগ্রহ, হেদায়েত ও সিরাতুম্মুস্তাকীম দানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সংঘবদ্ধতাহীন ঈমানের জন্যে এ ফলাফলের ঘোষণা দেয়া হয়নি। সংগঠনের অধীন ঈমান এবং সংগঠনমুক্ত ঈমানের পার্থক্য এখান থেকে সুস্পষ্ট। আল্লাহর রহমত অনুগ্রহ হেদায়াত ও সিরাতুম্মুস্তাকীম পেতে হলে অবশ্যি সংগঠনের অধীন ঈমান থাকতে হবে।

www.bjilibrary.com

৫. নবী করীম (সঃ) মুসলমানদেরকে সংগঠনভুক্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহর নবী (সঃ) বলেছেন ঃ

اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَتُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

অর্থ ঃ "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহতায়ালা আমাকে এই পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা হলো ১. জামায়াত গঠন কর ২. (নেতৃত্বের আদেশ) শ্রবণ কর ৩. তা মেনে চলো ৪. হিজরত কর এবং ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ কর।" (আহমদ ও তিরমিজী)

এখানে পাঁচটি আদেশের মধ্যে তিনটিই সংগঠন সম্পর্কিত। অর্থাৎ মুসলমান সমাজকে জামায়াত গঠন করে নেতা নির্ধারণ, নেতার আদেশ এবং তার আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার জন্যে অপরিহার্য গুণ হলো সংগঠনভুক্ত হয়ে নেতার আনুগত্য করা।

৬. উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যা বুঝা যায় তা হলো সংগঠন ছাড়া ইসলামের কোন প্রশ্ন ওঠে না, সংগঠন ছাড়া ইসলামের কোন ভিত্তি নেই, সংগঠন ছাড়া ইসলাম কার্যকর হতে পারে না।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ইসলামকে সংগঠন ছাড়া উম্মতের নিকট দেননি। এজন্য সম্পূর্ণ যথার্থভাবে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ

'সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই।' لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِالْجَمَاعَةِ-

এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে ইসলামকে কার্যকর ও চালু রাখার জন্য সংগঠন অপরিহার্য। নবী করীম (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে যতদিন সংগঠন যথার্থভাবে ছিল ততদিন ইসলাম যথার্থভাবে কার্যকর ছিল। যখন থেকে সংগঠন ঠিক মান মোতাবেক বা প্রয়োজন মোতাবেক রইল না তখন থেকে ইসলামও যথার্থভাবে কার্যকর থাকল না। তাই সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, থাকতে পারে না– এ কথাটাই যথার্থ।

তাই প্রকৃত অর্থে ইসলামী আদর্শ ও সংগঠন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং দু'টো জিনিষ একই সাথে চলার কথা। ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় সংগঠন ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ফলে ইসলাম হয়ে পড়েছে শত-ছিন্ন একটি নৌকার পালের মত, যার রশিগুলো গেছে ছিঁড়ে, মাস্তুল গেছে ভেঙ্গে। ফলে তা বাতাসও আটকায় না, নৌকাও চলে না। কেবলমাত্র মুখ থুবড়ে একদিকে পড়ে রয়েছে।

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন ঃ

ইসলামী আদর্শ বা ইসলাম মানুষের নিকট আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান, মানব সমাজে বিজয়ী শক্তি হিসেবে কায়েম হওয়া বা চালু হওয়ার জন্যে এসেছে। নবী রাসূলগণ ইসলামকে দুনিয়ার বুকে কায়েম করে গেছেন, অন্যসব জীবন-বিধানের উপর একে বিজয়ী করে চালু করে গেছেন। নবীর অবর্তমানে উম্মতের উপর দায়িত্ব এসেছে সে কাজের। সেই পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে মানব সমাজে কায়েম করা এবং চালু করার যে চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনার কাজ সেই কাজেরই নাম ইসলামী আন্দোলন।

কুরআনের ভাষায় ঃ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

অর্থ ঃ "আল্লাহর পথে জিহাদ।" (সূরা ছফ ঃ আয়াত ১১)

আল্লাহর পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংগঠনের সম্পর্ক কি বা কতটুকু এটাই আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয়।

১. ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্যেই প্রয়োজন সংগঠনের, সংগঠন চালিকা শক্তি ঃ

ইসলামী আন্দোলন অর্থ-দ্বীন ইসলাম বাস্তবায়নের জন্যে চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা। এই চেষ্টা সাধনাকে ফলপ্রসূ করার জন্যে যে সংস্থা কার্যকর থাকে তারই নাম সংগঠন। অর্থাৎ চেষ্টা সাধনার যে কাজ তার নাম আন্দোলন আর চেষ্টা সাধনার কাজটা যে সংস্থা করে তার নাম সংগঠন। তাই সংগঠন আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। কাজেই চালিকা শক্তি না থাকলে কাজটাও হবে না। ফলে যেখানে ইসলামী আন্দোলনের জন্য সাংগঠনিক পর্যায়ে কোন কাজ নেই সেখানে ইসলামী আন্দোলনও নেই। পক্ষান্তরে যেখানে ইসলামী আন্দোলনের জন্য সাংগঠনিক কাজ মজবুত সেখানে আন্দোলনও জোরদার।

২. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত ঃ

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আন্দোলনের যা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য– মানবতার কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সংগঠন হুবহু সেই একই উদ্দেশ্যেই গঠিত ও পরিচালিত হয়। মূলতঃ দ্বীন কায়েমের (একমাতে দ্বীনের) উদ্দেশ্যেই আন্দোলন পরিচালিত হয়, সংগঠনও গঠিত হয় সেই আন্দোলন পরিচালনার জন্যে। যেন একটি ফ্যাক্টরী সমস্ত চেষ্টা-সাধনা উৎপাদনেরই জন্যে, আর ফ্যাক্টরীর মেশিনপত্র সেই কাজেই নিয়োজিত।

৩. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন একে অপরের জন্যে অপরিহার্য ঃ

সংগঠন ইসলামী আন্দোলনেরই জন্যে, ইসলামী আন্দোলন না থাকলে সংগঠনের কোনই প্রয়োজন নেই। আন্দোলনবিহীন সংগঠনের খোলসের কোনই মূল্য নেই।

www.bjilibrary.com

আবার সংগঠনবিহীন কোন আন্দোলনেরও অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

আন্দোলন দোলন থেকে উদ্ভূত। আন্দোলন মানেই গতি। গতি মানে সচলতা, গতি মানে অস্তিত্বের প্রমাণ, গতি মানে একামত- দণ্ডায়মান অবস্থা।

একটি সাইকেলের যখন গতি থাকে তখন সে দণ্ডায়মান। তার একামত আছে। কিন্তু তার গতি বন্ধ হয়ে গেলে আর সে খাড়া থাকতে পারে না একদিকে হেলে পড়ে যায়।

একটি স্রোতস্বিনী নদী কুল কুল বয়ে যায়। যতদিন তার স্রোতের গতি আছে ততদিন সে নাব্য। কিন্তু যখনই তার স্রোতধারা বন্ধ হয়ে যায় সেও হয়ে যায় বন্ধ্যা। সে নদীর বুকে বালুর চর পড়ে অথবা ঘন শৈবাল জমে, পানিতে চলাচলও হয়ে যায় বন্ধ।

তেমনি হলো একটি ইসলামী আন্দোলন। যতদিন তার আন্দোলন আছে, গতি আছে, ততদিন সে সচল। কিন্তু যখনই তার আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায় তখনই সে হয়ে পড়ে অচল। ইতিহাস থেকে আমরা তাই দেখি খোলাফায়ে রাশেদার পর সংগঠন অচল হয়ে পড়ে, আন্দোলনও গতি হারায়। ইসলামের নদীর চরে অনেক বালু জমে, ইসলামের নদীতে জন্ম নেয় অনেক শৈবাল, অনেক ভেজাল।

৪. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন একই ধারায় প্রবাহিত ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেই প্রসিদ্ধ হাদীসে কুদসীতেও দেখা যায় সংগঠন, নেতৃত্ব ও আনুগত্যের মূল লক্ষ্য হলো হিজরতের শিক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ অথবা আল্লাহর পথে চূড়ান্ত জিহাদের পূর্ব প্রস্তুতি হলো জামায়াত গঠন, নেতৃত্ব, আনুগত্য ও হিজরত। ৫টি জিনিষ, যথা ঃ

اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

হাদীসের ভাষায় - এই হলো সংগঠন ও ইসলামী আন্দোলনের মূল কথা। এ হাদীসে যেমন জামায়াতের গুরুত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি নেতৃত্বের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কর্মীদের আনুগত্য ও ত্যাগ-কুরবানীর শিক্ষার কথা হিজরতের মাধ্যমে আর সর্বশেষে আল্লাহর পথে জিহাদের কথা।

তাই দেখা গেলো ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে যেমন দরকার ইসলামী আন্দোলনের, তেমনি প্রয়োজন এর চালিকা শক্তি একটি সংগঠনের। কোন মুসলিম সমাজে যদি সংগঠনের দুর্বলতা দেখা দেয় তবে অনিবার্যভাবে ইসলামী আন্দোলন হয় থাকবে না, না হয় একেবারে ঝিমিয়ে পড়বে। তাই সংগঠনই মৌলিক বিষয় যার অস্তিত্ব দান ও হেফাজতের জন্যে মুসলিম সমাজের কাণ্ডারী পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ও মুসলিম উম্মতের সাধ্যমত চেষ্টা চালানো আবশ্যক।

www.bjilibrary.com

মানুষের অস্তিত্বের জন্যে যেমন বাতাসের প্রয়োজন, ইসলামের অস্তিত্বের জন্যে তেমনি প্রয়োজন সংগঠনের। অথচ মুসলিম উম্মাহ তার নেতৃবৃন্দ, মুসলিম দেশের শাসকবর্গ, মুসলমানদের বিশ্ব সংস্থাসমূহ দাওয়া কার্যক্রম এবং সমাজ সেবা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম করে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস পায়। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করে তাকে বাস্তবায়িত করতে হলে অবশ্যি অবশ্যি প্রয়োজন ইসলামী আন্দোলনের। গোটা দুনিয়ায় আজ জাহিলিয়াত আর বাতিলের রাজত্ব। হককে তার সমমর্যাদায় বসাতে হলে বাতিলের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষ অনিবার্য। তার জন্যে হকের যে শক্তির প্রয়োজন, সে শক্তি কেবলমাত্র সৃষ্টি করতে পারে একটি মজবুত সংগঠন। তাই আজো ইসলামকে বাস্তবায়িত করতে হলে সংগঠন কায়েম করে শক্তি অর্জন করতে হবে এবং সেই শক্তি নিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে। সেই জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ - আল্লাহর পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনই আজকে সময়ের দাবী যা পূরণ করার জন্য দরকার একটি সফল সংগঠনের।

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের গতিধারা ঃ

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। ইসলামী আন্দোলন যেমন হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে না, আবার দপ্ করে নিভেও যায় না। ইসলামী আন্দোলনের সূচনা ও প্রাথমিক অগ্রগতি হয় ধীর গতিতে, অতঃপর তা স্থিতিশীল হয়, চতুর্দিকে আন্দোলন ছড়ায়, চূড়ান্ত পর্যায়ে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ইসলামী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে দা'য়ীর আহ্বান। সে আহ্বানে সত্যনিষ্ঠ ২/১ জন হয়ত সাড়া দেন, ধীরে ধীরে আরো কিছু লোক তার সাথী হয়, সংগঠন গড়ে উঠে। বাতিলের পক্ষ থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ, নির্যাতন, জুলুম ও অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। ফলে সম্প্রসারণ হয় খুব কম। হকের পথে পরীক্ষা হয় বেশী। অতঃপর এক পর্যায়ে জনতা নিঃস্বার্থ আন্দোলনের কথা বুঝতে পেরে শামিল হয় সংগঠনে, আন্দোলনের গতিবেগ সৃষ্টি হয়। নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীর যথার্থ ভূমিকার মাধ্যমে আন্দোলন বিজয়ের পথে এগিয়ে যায়। আন্দোলন ও সংগঠনের এ গতি-প্রকৃতির কথাই পেশ হয়েছে আল-কুরআনের সূরা ফাতহের শেষ আয়াতে ঃ

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ-
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ- (سورة الفتح : ٢٩)

অর্থ ঃ "এ যেন একটি কৃষিক্ষেত্র যা প্রথমে তার অংকুর বের করে, পরে তাকে শক্তিশালী করা হয়, অতঃপর তা আরো মোটা ও শক্ত হয়ে দাঁড়ায় এরপর তা তার

www.bjilibrary.com

কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায় যা কৃষককে করে তোলে আনন্দিত ও মুগ্ধ এবং কাফেরদেরকে করে রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ।" (সূরা ফাত্হ্ ঃ আয়াত ২৯)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের এ গতিধারা উল্লেখ করতে গিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর সংগঠন প্রসংগে বলেন ঃ

"দল গঠনের এ প্রক্রিয়াটা প্রথম দিকে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে হতে থাকে। এমনকি ১৫ বছরে মাত্র কয়েকজন লোককে এ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। তবে এ প্রক্রিয়ায় যে নীতিটা অনুসরণ করা হয়েছিল তা হচ্ছে এই যে, সম্প্রসারণ কাজের (expansion) পাশাপাশি সংহতকরণের (consolidation) কাজও চালু রাখতে হবে।

এ কারণে এ সংগঠনের পরিধি যতই ব্যাপকতা লাভ করতে থাকলো ততই তা মজবুত, দৃঢ় ও সংহত হতে থাকলো। এভাবে একটি উল্লেখযোগ্য দল যখন গঠিত হয়ে গেল, তখন এত প্রবল শক্তি নিয়ে তা সামনে অগ্রসর হলো যে, তার বিজয় অভিযানের দুর্দম জোয়ারকে পৃথিবীর কোন শক্তিই ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা" (উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান। পৃষ্ঠা-১০০)

আজকেও কোন দেশে, কোন এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের আহ্বানে যে সংগঠন গড়ে উঠবে তা প্রথমে ধীর গতিতেই আগাবে বিপ্লবের চিরন্তন ধারা অনুযায়ী, অতঃপর তা স্থিতিলাভ করবে, কিছু লোক প্রশিক্ষণে ও প্রস্তুতি নিয়ে তৈরী হবে, সম্প্রসারণের সাথে সাথে সংহত করণ ও প্রশিক্ষণের কাজও এগিয়ে চলবে। রাজনৈতিক ময়দানে নেতৃত্ব ও সংগঠনের ইমেজ তৈরী হবে। এলাকায় এলাকায় স্থানীয় নেতৃত্বের ত্যাগ, কুরবানী, নিঃস্বার্থতা, গণ-সংযোগ ও সমাজ সেবার উদাহরণ সৃষ্টি হবে-এমনিভাবে ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে গণ-জোয়ার সৃষ্টি হবে, সাধিত হবে ইপ্সিত ইসলামী বিপ্লব।

www.bjilibrary.com

ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন ও ইসলামী বিপ্লব

আল্লাহতায়ালা খলীফা হিসেবে মানুষকে পাঠালেন দুনিয়ায়। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ)কে শিক্ষা দিলেন দুনিয়ার তাবৎ কিছু। অতঃপর শয়তানের শত্রুতা ও ফেরেশতাদের আনুকূল্যসহ এ দুনিয়ায় আসলেন হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া। এ দুনিয়ায় গড়ে উঠল পরিবার ও সমাজের ভিত্তি। আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ)কে দুনিয়ায় পাঠাবার কালে বলেছিলেন ঃ

فَامَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ- (سورة البقرة : ٣٨)

অর্থ ঃ "অতঃপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসবে, যারাই আমার সে হেদায়াত অনুসরণ করে চলবে তাদের জন্য কোন ভয় বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই।" (সূরা বাকারা ঃ ৩৮)

এরপর আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষের আগমন ঘটল, আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠালেন, কিতাব, সহীফা ও অহীর মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের নিকট হেদায়াত পাঠালেন। নবী-রাসূলদের উপর একামতে দ্বীনের দায়িত্ব অর্পিত হলো, তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা চালালেন। কখনো আল্লাহর দেয়া দ্বীনে হক, আল-ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। কখনো তা বাতিল শক্তির অধীনে কোন রকমে টিকে রইলো– হকও বাতিলের এক চিরন্তন সংগ্রাম চললো।

লক্ষ্য করার ব্যাপার আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার মানুষকে গোমরাহী থেকে বাঁচার জন্য হেদায়াত দিলেন, এর জন্য নবী-রাসূলদেরকে মনোনীত করে পাঠালেন। কিন্তু বাতিলের সাথে লড়াই করে হককে কায়েম করার যে কাজ সে কাজের দায়িত্ব দিলেন হকপন্থী মানুষদেরকেই। আম্বিয়ায়ে কেরাম বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ব্যক্তির ডাকে তদানীন্তন সমাজের মানুষ যে পরিমাণ সাড়া দিয়েছে, যে পরিমাণ ভূমিকা রেখেছে, সে পরিমাণই আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়েছে। নবী বা দা'য়ীর ডাকে মানুষের সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা হতে পারে। (১) একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক সে ডাকে সাড়া দিয়ে নবী বা দা'য়ীর কাজকে নিজের কাজ মনে করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং যারা এভাবে এগিয়ে আসল তারা পরস্পর সংগঠিত হল এবং সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে বাতিলের মোকাবেলা করল। (২) বিরাট জনগোষ্ঠী নবী বা দা'য়ীর কাজকে সমর্থন করে ইসলামী বিপ্লব সাধনের আওয়াজ তুলল।

www.bjilibrary.com

এ পর্যায়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ইসলামী বিপ্লবের একটি পর্যালোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ইসলামী বিপ্লব ঃ

হযরত আদম (আঃ)-এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুগে যুগে, দেশে দেশে আল্লাহ তায়ালা অগণিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তারা সবাই তাদের দায়িত্ব যথারীতি পালন করেছেন। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও সমাজের লোকদের ভূমিকার কারণে ফলাফল হয়েছে বিভিন্ন ধরনের। উল্লেখ্য, তাদের সকলেরই বাণী ও দাওয়াত ছিল একই। সবাই একই বিপ্লবী কালেমার ঘোষণা দিয়েছেন– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– আল্লাহ ছাড়া নেই কোন চূড়ান্ত বা সার্বভৌম শক্তি, যাকে মানা যায়- একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত।

তাদের দাওয়াতও ছিল অভিন্ন। সকল নবীই সমাজের লোকদের নিকট দাওয়াত পেশ করেছেন এই বলে ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ–

অর্থ ঃ "হে আমার কওমের লোকেরা! তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব কবুল কর, কেননা তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৯)

লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে; একই কালেমা, একই দাওয়াত, একই আল্লাহ প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি মানুষের নিকট পৌঁছেছে কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত নবীদের প্রতি দুনিয়ায় মানুষ একই রূপ ব্যবহার করেনি। কুরআন থেকে জানা যায়–

১. কতক নবীকে তদানীন্তন সমাজের মানুষ দ্বীনের দাওয়াতের কারণে মোটেই বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না এবং তারা শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছিল। আল্লাহর নবী হযরত জাকারিয়া (আঃ)সহ বনী ইসরাঈলের নবীদেরকে এমনভাবে হত্যা করা হয়েছিল বলে কুরআন থেকে জানা যায়। এইসব নবীগণ সমাজের মানুষের মধ্যে এমন সংখ্যক লোকও যোগাড় করতে পারেননি বলে বুঝা যায়, যারা নবী এবং তাদের স্বপক্ষ লোকদেরকে প্রতিরোধ শক্তির মাধ্যমে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহও সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

২. বেশ কিছু সংখ্যক নবীর উদাহরণ কুরআনে রয়েছে যারা দাওয়াতের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোক পেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও জনসাধারণ তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি বরং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে নবীদের বিরোধিতা করেছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহতায়ালা নবী ও তার সাথীদেরকে হেফাজত করে বাকীদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। হযরত নূহ (আঃ), হুদ

www.bjilibrary.com

(আঃ), লূত (আঃ), শোয়াইব (আঃ), ছালেহ (আঃ)-এসব নবীদের কওমের লোকদের ধ্বংস করা হয়েছে।

এসব নবীদের সংগী সাথীদেরও নিজেদেরকে রক্ষা করার মত প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহতায়ালা কুদরতি সাহায্যের মাধ্যমে তাদেরকে হেফাজত করেছেন।

৩. হযরত ইউনুস (আঃ)-এর উম্মতের ঘটনা হয়েছে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এ উম্মতও নবীকে মানেনি। নবী নিরাশ হয়ে আযাব আসন্ন মনে করে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই উম্মতকে ছেড়ে চলে যান। উম্মতের লোকজন একথা জানতে পেরে যখন বুঝতে পারে আযাব আসন্ন তখন তওবা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন।

৪. এমন নবীর উদাহরণও রয়েছে যারা উম্মতের মধ্যে দাওয়াত দিলে বেশ কিছু লোক তার সাথী হন, কিন্তু সমাজের প্রভাবশালী কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ও জনসাধারণ দাওয়াত কবুল করল না। আল্লাহ নবীকে তার অনুসারী দলসহ অন্যত্র হিজরত করার ফায়সালা দিলেন এবং হিজরতের পর ইসলাম কায়েম হল ও ইসলামী সমাজ গঠিত হল। এভাবে ইসলমী বিপ্লব কামিয়াব হল। এ ধরনের নবী হলেন হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)।

হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে মিসর থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিন এলাকায় চলে এলেন। ফেরাউনকে আল্লাহতায়ালা সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলেন। মূসা (আঃ)-এর উম্মত নবীর সাথে অনেক বেয়াদবীপূর্ণ ব্যবহার করেছে, শিরকে লিপ্ত হয়েছে, নবীর সাথে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হতে অস্বীকার করেছে।

কিন্তু নবী করীম (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাবার পর তার অনুসারীদেরকে তৈরী করেছেন এবং কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করে আল্লাহর সাহায্যে বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করে ইসলামকে কায়েম করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর আরবের সকল বিরোধী শক্তি রাসূলুল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী-সাথীগণ-সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের সাথে হযরত মূসার (আঃ) উম্মতের ন্যায় বেয়াদবী পূর্ণ কোন আচরণ করেননি বরং উৎকৃষ্ট সহযোগীর পরিচয় দিয়েছেন। তারা রাসূলকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছেন, সদা সর্বদা পূর্ণ আনুগত্য করেছেন, রাসূলের আহ্বানে হিজরত করেছেন এবং যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। সবর, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর পথে দান ও ইসারের (অন্যকে অগ্রাধিকার দান) গুণে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। তাই তাদের ব্যাপারে কুরআন ঘোষণা করেছে– "আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট।"

www.bjilibrary.com

এমন গুণসম্পন্ন একটি উম্মত যখন রাসূলের সাথী হয়ে বাতিল শক্তির মোকাবিলা করেছে তখন আল্লাহর সাযায্য এসেছে তাদের প্রতি। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বাতিলকে নির্মূল করে ইসলামের বিজয় দান করেছেন। ফলে ইসলামী বিপ্লব পূর্ণত্ব লাভ করেছে।

৫. এমন কিছু নবীর উদাহরণও কুরআন পাকে রয়েছে যারা তাদের দাওয়াত ও ভূমিকার কারণে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গসহ সমাজের সাধারণ জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করেছিলেন। এ রকম নবীগণ হলেন হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলাইমান (আঃ)। এসব নবীদেরকে বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় মজবুত কোন ভূমিকা পালন করতে হয়নি। তাই এসব নবীগণ তাদের দাওয়াত ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে সাথে নিয়েই ইসলামী বিপ্লব সাধন করেন।

এ পর্যায়ে উল্লেখ্য, প্রত্যেক নবীই ইসলামী আন্দোলন করেছিলেন, চূড়ান্ত ইসলামী বিপ্লব কে কতটুকু করতে পেরেছিলেন তা ইতিহাসের ব্যাপার কিন্তু কে কতটুকু সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বা কতটুকু সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করেছিলেন তা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। অবশ্য এ ব্যাপারে আল-কুরআনে বা হাদীসে যথেষ্ট পাওয়া যায় না। আল-কুরআনের বর্ণনা থেকে অবশ্য কিছুটা আঁচ করা যায়। সেই নিরিখে আম্বিয়ায়ে কিরামের ইসলামী আন্দোলনে সংগঠন পর্যায়ে আমরা আলোচনা করে দেখি।

আম্বিয়ায়ে কিরামের ইসলামী আন্দোলন সংগঠন ঃ

হযরত নূহ (আঃ)

হযরত আদম (আঃ)-এর পর কুরআনে উল্লেখিত নবী হলেন হযরত নূহ (আঃ)। তিনি হাজার বছরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। আল-কুরআনে নূহ নামেই একটি সূরা রয়েছে। সেখানে বিস্তারিতভাবেই তার দাওয়াত, দাওয়াতের ফলাফল, আল্লাহর পক্ষ থেকে নৌকা বানানোর অহী, মহাপ্লাবন, বিরোধী শক্তি নির্মূল হওয়া এবং মোমেনদের হেফাজত সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘদিন নবীর দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও সে সমাজের লোকেরা দ্বীনের পথে আসল না। তাই মহাপ্লাবনের গজব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করা হলো। নূহ (আঃ) এ ধরনের সাংগঠনিক শক্তি নিশ্চয়ই অর্জন করেনি যাতে বিরোধী শক্তিকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু মোটামুটি সাংগঠনিক শক্তি অর্জিত হয়েছিল বলে মনে হয়। একটি বিরাট নৌকা তৈরীর ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট সময়ে নৌকায় সকল মোমেনদেরকে ওঠানো, সাথে সাথে দুনিয়ার সকল প্রজাতির প্রাণী জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় ওঠানো একেবারে চাট্টিখানি কথা নয়। নিশ্চয়ই একটি সংগঠন এ পর্যায়ে কাজ করেছে। তাই নূহ (আঃ)-এর এই ডাক–

www.bjilibrary.com

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ-

অর্থ ঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" (সূরা শু'আরা ঃ ১৯)

একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল মনে হয় না। এই ডাকে সাড়া দিয়ে মোমেনদের একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল কিন্তু সমাজের লোকেরা সেই ডাকে সাড়া দেয়নি। তাই আল্লাহ কুদরতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মহাপ্লাবন দিয়ে বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

হযরত নূহ (আঃ)-এর পর কুরআনে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ নবী হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। ইরাকের রাজবংশে তাঁর জন্ম। তার দাওয়াতের ফল হলো সম্পূর্ণ উল্টা। সমাজের লাক তাকে সহ্য করতে রাজি হল না। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। আল্লাহ কুদরতের মাধ্যমে তাঁকে হেফাজত করলেন। অতঃপর তিনি সে দেশ থেকে হিজরত করলেন কেবলমাত্র স্ত্রী সারা ও ভাতিজা হযরত লূত (আঃ)কে নিয়ে। অতঃপর গোটা আরব উপমহাদেশে দ্বীনের দাওয়াতের কাজে অবিশ্রান্ত তৎপরতার দীর্ঘ ইতিহাস। তিনি ফিলিস্তিনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে হযরত লূত (আঃ)কে নিয়োজিত করলেন, হযরত ইসমাঈল (আঃ)কে মক্কায় নির্বাসিত ও পুনর্বাসিত করলেন। এছাড়া আরবের বিভিন্ন স্থানে দাওয়াত ও ইসলামী বিপ্লবের এমন সফল আঞ্জাম প্রদান করলেন যাতে বলা হয়েছে ঃ

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ-

অর্থ ঃ "তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত।" (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

হযরত ইসমাঈলকে জবেহ করা, হযরত ইসমাঈলসহ কাবা ঘর নির্মাণ, হযরত ইসহাকের বংশধারায় অগণিত নবীর আগমন ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহ থেকে বুঝা যায় যে বিরাট ব্যক্তিশালী এ ব্যক্তিটি গোটা আরব তথা তদানীন্তন বিশ্বে ইসলামী বিপ্লব সাধনে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় তিনি যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করেছিলেন। গোটা আরবের বুকে ইসলামী আন্দোলনের এ ব্যাপক তৎপরতা সফল সাংগঠনিক তৎপরতারই প্রমাণ বৈকি।

হযরত ইব্রাহীম পরবর্তী কতিপয় নবী (আঃ) ঃ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের কিছু সংখ্যক নবীর উল্লেখ কুরআন শরীফে রয়েছে ঃ হযরত লূত (আঃ), হযরত হূদ (আঃ), হযরত ছালেহ (আঃ), হযরত শোয়াইব (আঃ)। এ সকল নবীর কারো দাওয়াতই সমাজের লোকেরা গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তায়ালা এসব কওমের লোকদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সাথে সাথে নবী ও তার সংগী-সাথীদেরকে হেফাজত করেছেন কুদরতিভাবে। বুঝা যায় এসব নবীদের সংগঠন খুবই দুর্বল ছিল যা সমাজে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই আল্লাহ তায়ালা কুদরতের মাধ্যমে তাদেরকে হেফাজত করেছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত ইউসুফ (আঃ)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নবী হলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিষ্কলুষ চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বই তাকে রাজপদে অভিষিক্ত করে তোলে। কালক্রমে মিসরের বাদশাহী তারই হাতে চলে আসে। ফলে তিনি একই সাথে নবুয়তের দায়িত্ব ও বাদশাহী পরিচালনা করেন। বস্তুতঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আমলেই ইসলাম সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাষ্ট্র নিজেই একটি সংগঠন। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ইসলামী আন্দোলন পরিচালনায় সংগঠন তৎপর ছিল বলেই ধরা যায়।

হযরত মূসা (আঃ)

মিসরে ফেরাউন বংশধরদের রাজত্বকালে হযরত মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাব। বাহ্যতঃ প্রথমে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) এই দুই ব্যক্তিই ফেরাউনের দরবারে গিয়েছিলেন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে যাদুকরগণ তার প্রতি ঈমান আনে। বনী ইসরাঈলদের তিনি সংগঠিত করেন। এভাবে তিনি নিশ্চয়ই একটি সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করেন। যার ফলাফলে আমরা দেখতে পাই দেশের হাজার হাজার বনী ইসরাঈলকে একরাতে তিনি একত্রিত করে দেশত্যাগ করে রওয়ানা দিলেন। কোন সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া তাদেরকে এভাবে একত্রিত করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু নিঃসন্দেহে তারা ফেরাউনের শক্তি মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখত না। কাজেই আল্লাহ তায়ালা কুদরতের মাধ্যমে ফেরাউন ও তার লোক-লস্করকে ডুবিয়ে মারলেন। হযরত মূসা (আঃ) ও তার লোকজনদেরকে হেফাজত করলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলদের জনসমষ্টি নিয়ে যে সমাজ গড়ে তুললেন তা মোটামুটি সংগঠিতই ছিল। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর সংগঠনের মান অর্থাৎ আনুগত্যের মান দুর্বল ছিল বলেই আল-কুরআনে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ মূসা (আঃ) যখন হারুন (আঃ)কে স্থলাভিষিক্ত করে ৪০ দিনের জন্য তুর পাহাড়ে গেলেন, কওমের লোকেরা হারুন (আঃ)-এর নিষেধ অমান্য করে এক বাছুর তৈরী করে তার পূজা করা শুরু করে।

দ্বিতীয়তঃ লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে নবীর সংগী সাহাবীরা বলে "তুমি তোমার খোদা গিয়ে লড়াই করগে, আমরা এখানে বসে রইলাম।

এছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক মান্না ও সালওয়া খেতে অস্বীকৃতি, শহরে ঢুকতে গিয়ে বলার শব্দ পরিবর্তন ইত্যাদি বহু বেয়াদবিপূর্ণ আচরণ পাওয়া যায় মূসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে। ফলে মূসা (আঃ)-এর সাথে বহু লোকের সমাবেশ ঘটলেও সুস্পষ্টভাবেই তাঁর সংগঠনে দুর্বলতা ছিল। বিশেষ করে আনুগত্যের মান ছিল খুবই দুর্বল।

www.bjilibrary.com

বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবীদের মধ্যে সংগঠন ঃ

পরবর্তী সময়ে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বহু নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের বিস্তারিত ইতিহাস মানব জাতির নিকট নেই। আল-কুরআন থেকে যতটুকু জানা যায় তা থেকে বুঝা যায় যে, তাদের নবীর উম্মতের মধ্যে কে তাদের বাদশা হবেন সে ঘোষণা দেন, বাদশার পক্ষ হয়ে বিরোধী পক্ষের সাথে তারা লড়াই করে (যদিও তাদের মধ্যে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়), আল্লাহর হুকুমে বিরোধী বাহিনীর কমান্ডার জালুতকে দাউদ হত্যা করেন। এরপর হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলাইমান (আঃ) নবুয়ত ও বাদশাহী একই সাথে পরিচালনা করেন। কোন সেনাবাহিনী থাকা, বাদশাহী পরিচালনা সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই বনী ইসরাঈলের অনেক নবীর মধ্যে যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তি ছিল বলে আভাষ পাওয়া যায়। অবশ্য কোন কোন নবী মোটেও সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে পারেননি বলে জানা যায়, যাদেরকে উম্মতের লোকেরা হত্যা করেছে বলে কুরআন উল্লেখ করে।

হযরত ঈসা (আঃ)

কালক্রমে হযরত ঈসা (আঃ) অনুসারীদের পক্ষ বিরাট রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলেছে। ঈসা (আঃ)-এর জীবদ্দশায় হাজার হাজার লোক তার ভক্ত অনুসারী হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই মহান নবী তার ভক্তদের মধ্য থেকে খাঁটি লোকদেরকে নিয়ে একটি মজবুত সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যে বার জন লোক তার নিকট শিষ্য বলে পরিচিত লাভ করলো তাদের মধ্য থেকেই একজন বিশ্বাস ঘাতকতা করে বিরোধী ইহুদী রাজশক্তিকে তার অবস্থানের খবর জানিয়ে দিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উঠিয়ে নিলেন তার কুদরতের মাধ্যমে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে যেখানেই তিনি যেতেন বহু লোক তার ভক্ত, অনুরক্ত ও অনুসারী হত, কিন্তু রাজশক্তি তার বিরোধিতা করল অথচ তার মোকাবেলায় কোন মজবুত সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে উঠল না। ফলে আল্লাহ তায়ালা জনসাধারণের কোন আযাব নির্ধারণ করলেন না বরং যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাকে ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি দিয়ে ঈসা (আঃ)কে উঠিয়ে নিলেন আর ঐ ব্যক্তিকে আযাবের সম্মুখীন করলেন। সংগঠনের দুর্বলতাই ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পথে এ বাধার সৃষ্টি করল।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সংগঠন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ

এ সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান" বইতে "ইসলামী আন্দোলনের মূলনীতি" সম্পর্কে যা লিখেছেন তা প্রনিধানযোগ্য।

"রাসূল (সাঃ)-এর ইসলামী সংঘ তৈরীর প্রক্রিয়া ছিল এই যে, প্রথমে তিনি গোটা সমাজের মধ্য থেকে সেই সব লোককে বাছাই করে নিলেন, যারা

www.bjilibrary.com

জন্মগতভাবেই নিরেট সত্যনিষ্ঠ ও পাপ পঙ্কিলতা মুক্ত, পবিত্র জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যতা ও মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। অতঃপর জ্ঞান দান ও প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম কৌশল প্রয়োগ করে তাদের প্রত্যেককে বিশুদ্ধ করেন। প্রত্যেকের মনে জীবনের এক মহৎ ও উচ্চতর লক্ষ্য বদ্ধমূল করেন এবং তার চরিত্রকে এতটা মজবুত, দৃঢ় ও অনমনীয়ভাবে গড়ে তোলেন যে সে যেন ঐ লক্ষ্যের জন্য অটল ও অবিচলভাবে চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রামে নিয়োজিত হয়, কোন স্বার্থের প্রলোভনে বা কোন ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা তাকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ করতে সক্ষম না হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এসব বিশুদ্ধ চরিত্রের ব্যক্তিবর্গের নিয়ে একটি জামায়াত গড়ে তোলেন, যাতে ঐ সব ব্যক্তির মধ্যে কোন দুর্বলতা অবশিষ্ট থেকে থাকলে জামায়াতের সামষ্টিক শক্তি প্রয়োগে তা দূর করা যায়। সামাজিক পরিবেশ যেন এমন রূপ পরিগ্রহ করে যে, সৎ গুণাবলী ও মহৎ কাজসমূহ বিকাশ লাভ করতে পারে এবং অন্যায় ও অসৎ কার্যাবলী নির্মূল হয়ে যায়। সমাজের লোকেরা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার ব্যাপারে পরস্পরের সহায়ক ও সহযোগী প্রক্রিয়াটা একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের সুনিপুণ নির্মাণ কৌশলের সাথে তুলনীয়– যিনি কাঁচা ইটের একটা বিরাট স্তূপের মধ্য থেকে বাছাই করে সর্বোত্তম ইটসমূহ গ্রহণ করেন, অতঃপর সেই বাছাই করা ইটগুলোকে এমন নিখুঁতভাবে পোড়ান যে, প্রতিটি ইট পোক্ত ও পরিপক্ক হয়ে যায়। আর শেষে উক্ত ইটগুলোকে উৎকৃষ্ট মানের সিমেন্ট দ্বারা যুক্ত করে এক মজবুত অট্টালিকা নির্মাণ করেন।

এ সংগঠনের প্রধান মূলনীতিগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

এক. জামায়াতের সকল সদস্যকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে করে তারা ইসলাম ও কুফরীর মধ্যকার পার্থক্য ও ব্যবধান বুঝতে পেরে ইসলামী রীতিনীতির ওপর দৃঢ়ভাবে বহাল থাকতে সক্ষম হয়।

দুই. সামষ্টিক ইবাদত দ্বারা জামায়াতের সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

তিন. জামায়াতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের এমন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ও সীমানা চিহ্নিত করতে হবে, যাতে করে তারা অন্যান্য জাতির সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে না পারে এবং প্রকাশ্যে ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়েই তারা একটা পৃথক ও স্বতন্ত্র জতিরূপে বহাল থাকতে পারে। এ কারণেই অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চালচলনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চার. সমগ্র সামাজিক পরিমন্ডলে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ প্রতিহত করা) চালু থাকবে, যাতে মুসলিম সমাজে কোন বিকৃতি, গোমরাহী ও বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়া মাত্রই তা নির্মূল করে দিতে হবে এবং মোনাফেকদের

www.bjilibrary.com

সাথে এত কঠোর আচরণ করতে হবে যে, হয় তারা মুসলমানদের জামায়াত থেকে বেরিয়ে যাবে নতুবা থাকতে হলে এমনভাবে থাকবে যেন কোন বিভেদ, বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয়।

পাঁচ. সমগ্র মুসলিম একটি সমিতিতে পরিণত হবে। প্রত্যেক মুসলিম নরনারী শুধুমাত্র ইসলামী অধিকারের ভিত্তিতে তার সদস্যপদের সমমর্যাদা লাভ করবে। এ সমিতিতে এমন আভিজাত্য, তারতম্য ও ভেদাভেদ থাকবে না, যা মুসলমানে মুসলমানে বিভেদ ও বৈষম্যের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক মুসলমানের জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও মতামত দেবার পূর্ণ অধিকার থাকবে। এমনকি একজন গোলামও যদি কাউকে নিরাপত্তা দেয় তাহলে তা হবে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকেই নিরাপত্তা দানের শামিল।

ছয়. জামায়াতের সকল ব্যক্তির জীবনের একই লক্ষ্য নির্ধারিত থাকবে এবং সে লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্মক সংগ্রাম এবং ত্যাগ ও উৎসর্গের মনোভাব তাদের মধ্যে থাকতে হবে। একটি গোষ্ঠী শুধুমাত্র উক্ত লক্ষ্য হাসিলের জন্যে সার্বক্ষণিকভাবে কাজে নিয়োজিত থাকবে। অন্যরা নিজেদের অর্থোপার্জনের তৎপরতা চালানোর পাশাপাশি উক্ত গোষ্ঠীর সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে থাকবে। আর সামগ্রিকভাবে সমগ্র জামায়াতে ও তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মনে সর্বদা এ চিন্তা জাগরূক থাকবে যে, তার জীবনের আসল উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জন নয় বরং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ সু-সম্পন্ন করা।

দল গঠনের এ কয়টি মূলনীতির অনুসরণ দ্বারাই সেই দোর্দন্ড প্রতাপশালী সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল, যা দেখতে দেখতে অর্ধেক দুনিয়ার উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল। [পৃঃ ৯৮-১০০]

রাসূলুল্লাহর সংগঠনের আরো একটি দিক উল্লেখযোগ্য ঃ

১. এ সংগঠন অহীরই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ও পরিচালিত হয়েছিল। নবুয়তের ২৩ বছরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সবই ছিল অহীর ভিত্তিতে, আল-কুরআন যেসব পদক্ষেপ ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা করেছে, ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করেছে, সংশোধনী ও পরবর্তী পদক্ষেপের পথ বাতলেছে। তাই রাসূলুল্লাহ কর্তৃক গঠিত এ সংগঠন কুরআন অনুমোদিত একটি সংগঠন। কুরআনের ভাষায় যার নাম حِزْبُ اللّٰهِ আল্লাহর দল।

২. এ সংগঠনের উদ্দেশ্য দুনিয়ার মানুষের কল্যাণ, আখেরাতের মুক্তি ও সাফল্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কুরআনে এ উদ্দেশ্যের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং মোমেনদেরকে সেভাবেই তৈরী করা হয়েছে। সাথে সাথে মোমেনদের আলাদা পরিচয়ের কথা কুরআনের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে এটা বলে দেয়া হয়েছে যে এ সংগঠনের সদস্য হবে কেবল মাত্র খাঁটি মোমেন ও একনিষ্ঠ মুসলমানগণই।

www.bjilibrary.com

৩. এ সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি গোটা বিশ্বমানবতার মধ্যে অনন্য এক বিরল চরিত্রের অধিকারী। নেতৃত্বের সমস্ত গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় তার মধ্যে বিরাজমান।

৪. এ সংগঠনের কর্মীবাহিনী সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এমন সব উন্নত মানের উদাহরণ পেশ করে গেছেন যা নজীরবিহীন– না এর উদাহরণ অতীতে কোনদিন পাওয়া গেছে, না পরবর্তী কোন কালে তা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল-কুরআনে তাদের বহুমুখী গুণের বর্ণনা যেমন রয়েছে তেমনি তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ–

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তুলনাহীন নেতৃত্ব, সাহাবায়ে কেরামের নজীরবিহীন আনুগত্য এমন উন্নত এক সংগঠন কাঠামোর সৃষ্টি করেছিল যা বিশ্বমানবতাকে উপহার দিয়েছিল অর্ধকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এক ইসলামী বিপ্লব যা বিশ্ব ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সংগঠন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সংগঠন শক্তিকে রাজশক্তিতে পরিণত করেছিলেন। হিজরতের পূর্বে আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে যে দোয়া শিক্ষা দিলেন ঃ

وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا–

অর্থ ঃ "এবং (হে রব) তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী একটি রাজশক্তি আমাকে দান কর।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৮০)

হিজরতের পর সে রাজশক্তি তিনি লাভ করলেন। এভাবে সংগঠন শক্তি রাজশক্তির সাথে মিলিত হল। অতঃপর জেহাদ ও ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে গোটা আরবে ইসলাম কায়েম হল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বে সংগঠন পূর্ণভাবে কার্যকর থাকল।

রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর খেলাফত কায়েম হল। সংগঠন ও রাজশক্তি যথারীতি বহাল রইল। হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) পর্যন্ত খেলাফতের সাথে সংগঠন শক্তি পুরাপুরি কার্যকর ছিল। ইসলামের বিজয়ের ক্ষেত্রে এ যুগটা ছিল স্বর্ণযুগ। হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত কাল থেকেই সংগঠনে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। মুসলিম উম্মাহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে হযরত আলী (রাঃ) অপরদিকে আমীর মুয়াবিয়া– মুসলিম মিল্লাতের এই দুই ব্যক্তিত্বের দুই দিকে মুসলিম জনতাকে আহ্বান নিঃসন্দেহে তদানীন্তন মুসলিম সমাজের সাংগঠনিক দুর্বলতার চরম প্রকাশ। শুধু আহ্বান নয়,

www.bjilibrary.com

এই দুই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে পরপর কয়েকটি যুদ্ধ হয়ে গেল। যার শেষ পরিণতি টানা হলো হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে।

এ ঘটনা থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, সে সময় মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা কেন্দ্রীয় কমান্ড ছিল না যার নির্দেশ গোটা উম্মত নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের কারণেই এমনটা হয়েছিল। হযরত ওসমানের শাহাদাত তদানীন্তন মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির বিরাট কারণ হিসেবে দেখা দেয় যা মুসলিম সমাজের সংগঠনে বিরাট ফাটল সৃষ্টি করে। সংগঠনের পিছনে নেতৃত্বের ভূমিকা যে প্রধান বিষয় তাও এখান থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ পর্যায়ে মুসলিম সংগঠনে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হলো, আমীর মুয়াবিয়ার রাজত্বকালের পরবর্তী সময়ে সে সংগঠন বলতে গেলে খতমই হয়ে গেল।

হযরত মুয়ারিয়া (রাঃ) উম্মতের নিকট থেকে বলতে গেলে জোর করে ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াতের ওয়াদা আদায় করলেন। ইসলামী সংগঠনের তরীকা এটা ছিল না। ইয়াজিদ খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আমীরুল মুমিনীন হলেন ঠিকই, কিন্তু তা কেবল মাত্র রাজনৈতিকভাবেই বহাল হল, দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণ তাকে আমীরুল মুমিনীন মনে করলেন না। খেলাফতের বদলে রাজতন্ত্র চালু হয়ে গেল। যে সংগঠনশক্তি ও রাজনৈতিক শক্তির বলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলামী বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন সে ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক শক্তি কার্যকর রইল, সংগঠনশক্তি খতম হয়ে গেল।

ইয়াজিদের সময়কালে হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর উত্থান একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। নিঃসন্দেহে হযরত হুসাইন (রাঃ) অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করে উম্মতের নিকট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। কিন্তু হযরত হোসাইন (রাঃ) সংগঠন-শক্তিকে বহাল করে সাংগঠনিক ফয়সালা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন– এমনটা ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না। হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর কুফা গমনের ব্যাপারে অনেক সম্মানিত সাহাবী নিষেধ করেছিলেন বলে ইতিহাসে দেখা যায়। হযরত হোসাইন (রাঃ) উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করে বা তাদের পরামর্শ করে যদি ফয়সালা নিতে পাবতেন তাহলে হয়ত সংগঠনকে পুনর্জীবিত করা যেতো, কিন্তু তিনি তার একক সিদ্ধান্তেই কাজ পরিচালনা করেছেন বলে দেখা যায়। হয়ত রাজশক্তির মোকাবেলায় সংগঠনকে দাঁড় করানো কঠিন ছিল কিন্তু সংগঠনকে পুনর্জীবিত করতে পারলে হয়ত ইসলামের পরবর্তী ইতিহাস ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত।

www.bjilibrary.com

এরপর উমাইয়া শাসনামলে হযরত উমার ইবনে আবদুল আজিজের উত্থান ইসলামের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল ঘটনা। তিনি পুনরায় খেলাফতের শাসন চালু করেন কিন্তু তিনিও সংগঠনকে সেই মানে গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে কয়েক বছরের শাসনের পর তার ইন্তেকালে আবার খেলাফত খতম হয়ে যায়। সংগঠনের অনুপস্থিতির কারণেই এমনটা ঘটে গেল। সংগঠন ঠিক মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারত।

অতঃপর সংগঠনের অনস্তিত্বের দীর্ঘ ইতিহাস। এ সময়কালে ইসলামের বেশ বড় বড় অনেকগুলো কাজ হয়েছে। এই সময়ে হাদীস শাস্ত্রের সংকলন হয়েছে ব্যাপকভাবে, তাফসীর শাস্ত্রও ব্যাপকতা লাভ করেছে, ফেকাহ শাস্ত্রে উন্নতি হয়েছে। মুসলিম মনীষীদের এসব অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু সংগঠনকে পুনর্জীবিত করে ইসলামী বিপ্লবকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার কাজটি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি বলেই ইতিহাসে দেখা যায়। উমাইয়া ও আব্বাসীয়া খেলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছে সত্য, কিন্তু ইসলামী বিপ্লব দুনিয়ায় যে কল্যাণ সাধনের স্বাক্ষর রেখেছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি। ইসলামের যথাযথ বাস্তবায়নে সংগঠনের অনুপস্থিতিই এর প্রধান কারণ।

এরপর মুসলমানদের পতনের যুগ। এ পতন যুগেও বহু মুসলিম মনীষী মুসলিম সমাজে জাগরণ আনয়নের চেষ্টা-তদবীর করেছেন। উপমহাদেশে হযরত আবদুল ওয়াহাবের সংস্কারবাদী আন্দোলন, ভারত উপমহাদেশে মুজাদ্দেদে আলফে সানীর সংস্কারবাদী আন্দোলন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইসলামী বিপ্লবের আওয়াজ তুললেন কিন্তু কোন সংগঠন সেভাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন বলে দেখা যায় না। ভারত উপমহাদেশে ঊনবিংশ শতকে সাইয়েদ আহমদ শহীদ একটি ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুললেন যার পিছনে একটি সাংগঠনিক শক্তি সৃষ্টি হলো এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রেরও পত্তন হলো। কিন্তু নানা চক্রান্তের কারণে সেটা টিকে রইল না। সাইয়েদ আহমদ এবং তর সংগী সাথীদের অনেকেই শাহাদাত বরণ করলেন।

অতঃপর বিংশ শতকে আরব-ভূ-খন্ডে মনীষী হাসানুল বান্নার নেতৃত্বে এবং ভারত ভূ-খন্ডে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নেতৃত্বে দু'টি সংগঠন গড়ে উঠল যা বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)-এর সংগঠন ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে মুসলিম উম্মতের মধ্যে বহু মুজাদ্দেদ, সংস্কারক, পন্ডিত ও বিভিন্নমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে এবং তারা স্ব স্ব অবদান সমাজে রেখে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী যেভাবে

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহর হুবহু অনুকরণে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন তার কোন নজীর নেই। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কুরআন, হাদীস ও সীরাত থেকে খুঁজে খুঁজে সংগঠনকে সকল খুঁটিনাটি বিষয় সংগ্রহ করে তা সংগঠনে সংযোজিত করেছেন। তাঁর এবং তাঁরই সমসাময়িক কালে আরব দেশে গঠিত সংগঠনের ফলে আজ গোটা বিশ্বে ইসলামী রেনেসাঁর আওয়াজ উঠেছে, গড়ে উঠেছে বিশ্ব ইসলামী সংস্থাসমূহ, মুসলিম দেশের শাসকবর্গ ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের স্বীকৃতি দিচ্ছেন, বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়া ও সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়েছে। মুসলিম সমাজ তাদের আত্মচেতনা ফিরে পেয়েছে। আজ দেশে দেশে সেই সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে এই সংগঠন দুনিয়াবাসীকে কোন সফল ইসলামী বিপ্লব উপহার দিতে পারবে কিনা তা ইতিহাসের ব্যাপার।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মুসলিম সমাজ মানেই ইসলামের বাস্তবায়ন (একামতে দ্বীন) নয় বরং একামতে দ্বীনের জন্য দরকার ইসলামী আন্দোলনের। আর ইসলামী আন্দোলন তখনই চলতে পারে যখন তার জন্য তৎপর থাকে একটি সংগঠন। যে সংগঠন না থাকার কারণেই হয়েছে মুসলিম সমাজের অধঃপতন, ইসলামী আদর্শের বিকৃতি। আজো ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে হলে শুরু করতে হবে একটি ইসলামী আন্দোলন যার জন্য অপরিহার্য একটি সংগঠন। সে ধরনের একটি সংগঠনের জন্য কি কি প্রয়োজন তা-ই আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

www.bjilibrary.com

সংগঠন ঃ দুর্বলতা ও মজবুতি

সংগঠন

ইংরেজী Organisation ও আরবী تَنْظِيْمَ তানযীম শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংগঠন। جَمَاعَةُ জামায়াত, দল বা পার্টি শব্দ দ্বারাও সংগঠনের অর্থ প্রকাশ করে। আন্দোলন ও সংগঠন এক জিনিষ নয়। আন্দোলন মানে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা ও সাধনা, ইংরেজিতে যাকে বলে Movement. আন্দোলন বা চেষ্টা সাধনার জন্যে নিয়োজিত যে সংস্থা তার নাম সংগঠন। অর্থাৎ চেষ্টা সাধনার নাম আন্দোলন এবং চেষ্টা সাধনা পরিচালনা করে যেই সংস্থা তার নাম সংগঠন।

অর্থনীতিতে যেমন সংগঠন মানে অন্যান্য উৎপাদন উপাদানকে যে কাজে লাগায়, যে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং যে ঝুঁকি গ্রহণ করে -- বিপ্লবের ক্ষেত্রেও তেমনি যে সংস্থাটি জনশক্তিকে সংগ্রহ করে ও কাজে লাগায়, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করে সে সংস্থাটির নাম সংগঠন।

সংগঠনের জন্যে ৫টি উপাদান জরুরী।

১. একক উদ্দেশ্য ২. নেতৃত্ব ৩. কর্মীবাহিনী ৪. কর্মসূচী ৫. প্রয়োজনীয় অর্থ।

১. একক উদ্দেশ্য

সংগঠনের জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন হলো সংশ্লিষ্ট জনশক্তির একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকতে হবে। একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্যে তারা সমবেতভাবে কাজ করবে। এ যেনো একটি মেশিন, যার কল-কব্জা বিভিন্ন ধরনের, কিন্তু সবাই মিলে একটি মাত্র উৎপাদন সম্পন্ন করে থাকে।

আন্দোলনের গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কোন কল-কারখানার শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে আন্দোলন হতে পারে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সৃষ্টির মতো দেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আন্দোলন হতে পারে অথবা হতে পারে কোন আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যে আন্দোলন। মোটকথা - সংগঠনের প্রথম উপাদান হলো একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

বহু লোক একত্র হলেই সংগঠন হয় না। যেমন একটি বাজার-এখানে বহু লোক আসে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নিয়ে-উদ্দেশ্যের কোন ঐক্য বা এককেন্দ্রিকতা নেই। তাই এটা সংগঠন নয়। অথচ এই বাজারের জন্যে গঠিত কমিটি বাজার উন্নয়নের একক উদ্দেশ্যে গঠিত বলে উক্ত কমিটি একটি সংগঠন। সেই অর্থেই জামায়াতে ইসলামী একটি সংগঠন। কেননা তার মধ্যে একক উদ্দশ্য রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে গঠনতন্ত্র বলে "বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও

www.bjilibrary.com

রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য"।

যারা এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে একমত হন এবং নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই বানিয়ে নেন কেবলমাত্র তাদেরকেই জামায়াতে ইসলামীর রুকন বা সদস্য করা হয়। তাই জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্য পূর্ণভাবে পালিত।

২. নেতৃত্ব

সংগঠনের জন্যে দ্বিতীয় যে উপাদান জরুরী, তা হলো নেতৃত্ব। বহু লোক মিলে কোন একক উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তাদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচন বা নির্ধারণ একান্তভাবে জরুরী। প্রকৃতপক্ষে সংগঠনের প্রধান চালিকাশক্তিই হলো নেতৃত্ব। সংগঠনের শৃংখলা-বিধান, নিয়ম-নীতি অনুসরণ, কাজে-কর্মে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদি পদক্ষেপ নেতাকেই নিতে হয়।

ইসলামী আন্দোলনের অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায় নেতাকেই মূল আহ্বানকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। যুগে যুগে নবী রাসূলগণের নেতৃত্বেই আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তাঁরাই আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। পরবর্তী যুগেও নেতাকেই দা'য়ী ইলাল্লাহর – আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সংগঠনের নেতার ভূমিকা প্রধান হয়ে থাকে।

জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের কাঠামো। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (মরহুম) দা'য়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। এখন বিভিন্ন দেশে গঠনতন্ত্র মোতাবেক জামায়াতের নেতৃত্ব নির্ধারিত হচ্ছে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। কেন্দ্রের আমীরে জামায়াত থেকে নিয়ে ইউনিয়ন আমীর পর্যন্ত এক নেতৃত্ব কাঠামো গড়ে উঠেছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত আমীর না হলে সংশ্লিষ্ট নাযেম/সভাপতি গণ নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উদ্দেশ্যের যেমন অটুট ঐক্য প্রয়োজন, নেতৃত্বের তেমন বলিষ্ঠতা ও চরিত্রের সাবলীলতা দরকার মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য।

৩. কর্মীবাহিনী

নেতার কাজ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও হুকুম প্রদান। নেতাকে মানা ও হুকুম পালনের জন্যে সংগঠনের তৃতীয় উপাদন হলো কর্মীবাহিনী। সংগঠনের অবশ্যি একটি কর্মীবাহিনী থাকবে যা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে। সংগঠনে দেশের আইনের কোন বাধন নেই, এখানে রয়েছে নৈতিক বন্ধন। তাই কর্মীগণ যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজে এগিয়ে আসেন, তাহলেই প্রকৃতপক্ষে তারা কর্মী হিসাবে গণ্য। কর্মীদের জোর করে কাজ করানো সম্ভব নয়। তাই

www.bjilibrary.com

স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকারী কর্মীবাহিনী সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ইসলামী আন্দোলনে নবী-রাসূলগণ যে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেখানে একটি কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করা হয়েছে বিভিন্ন যুগে। তাঁরা ঘোষণা করেছেন "আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ও অহিপ্রাপ্ত তাই আমাদের আনুগত্য কর।

فَاَطِيْعُوْنَ- 'ফাআতিউন।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মীবাহিনী সাহাবায়ে কেরাম নির্দ্বিধায় ঘোষণা দিয়েছেন سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا "আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম"। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীবাহিনী সারাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন ইউনিটে ইউনিটে তারা বৈঠকে মিলিত হন, সংগঠনের ডাকে তারা সাড়া দেন।

৪. কর্মসূচী

সংগঠনের চতুর্থ উপাদান হলো কর্মসূচী। কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে একটি কর্মসূচীর অবশ্যি প্রয়োজন। কর্মসূচী মানে কাজ করার নিয়ম-পদ্ধতি। কোন সঠিক নিয়ম পদ্ধতি ছাড়া কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া যায় না। সংগঠন পরিচালনার জন্যে নিয়ম পদ্ধতির প্রয়োজন, যা গঠনতন্ত্রে লেখা থাকে। এ ছাড়া স্থায়ী কর্মসূচী ও বার্ষিক পরিকল্পনাও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নেতা ও কর্মী থাকা সত্ত্বেও সঠিক কর্মসূচী না থাকলে তা সংগঠনে পরিণত হবে না। তাই সংগঠন মানে দাঁড়ায়- কোন একক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে একটি যথার্থ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন যা রূপ লাভ করবে নেতা ও কর্মীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সংগঠনের উপাদান সম্পর্কে সহজ ভাষায় মনে রাখার মত করে বলা যায় ঃ নীতি-নেতা-কর্মী-কর্মসূচী। সংগঠনের বাস্তব উদাহরণ নামাযের জামায়াত। এখানে অংশগ্রহণকারীর সকলের একই উদ্দেশ্য-আল্লাহকে খুশী করা। একজন নেতা বা ইমাম রয়েছে এবং ইমামকে অনুসরণ করছেন মুক্তাদিবৃন্দ। এর মানে নামাজ আদায়ের রয়েছে একটি নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি। তাই নামাজের জামায়াত হলো সংগঠনের আদর্শ নমুনা।

৫. প্রয়োজনীয় অর্থ

সংগঠনের পঞ্চম উপাদান হলো প্রয়োজনীয় অর্থ-তহবিল বা ফান্ড। সংগঠনের অন্যসব উপাদান থাকা সত্ত্বেও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে কোন তহবিল না থাকলে সে সংগঠন অচল। তাই সংগঠনের ভিতরই এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে (কর্মসূচীর মধ্যেই) তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে যে জেহাদের কথা বলেছেন তা-ও জান ও মাল দিয়ে সম্পন্ন করার কথা বলেছেন। তাই সংগঠন মানে, কোন একক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নেতৃত্বের অধীনে কিছু সংখ্যক লোকের নির্দিষ্ট কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফান্ডসহ পদক্ষেপ গ্রহণ।

www.bjilibrary.com

উপসংহার ঃ

কোন বিপ্লব সাধনের জন্যে সংগঠন অপরিহার্য। আসলে দুনিয়ার যে কোন অর্থবহ কাজ বা প্রতিষ্ঠানের জন্যেই একটি সংগঠনের প্রয়োজন। ইসলামী বিপ্লবের জন্যেও তেমনি প্রয়োজন একটি সংগঠনের। বস্তুতঃ ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনই ইসলামী বিপ্লব ঘটাতে সরাসরি সহায়তা করে থাকে। তাই ইসলামী আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠন এ পর্যায়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

সংগঠনের দুর্বলতা ও মজবুতি ঃ

সংগঠন গড়ে উঠে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে। উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রগতি না হলে সংগঠনের যথার্থ মূল্য নেই। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন বা উদ্দেশ্য সাধন নির্ভর করে সংগঠনের মজবুতি বা নিষ্ক্রিয়তার উপর। সংগঠনের মধ্যে দুর্বলতা থাকলে উদ্দেশ্য সাধন বা তার অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই ভাল করে দেখা দরকার সংগঠনের দুর্বলতা কোন কোন দিক থেকে বা কোন কোন কারণে আসে। এসব দুর্বলতা দূর করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারলেই সংগঠনের মজবুতি আসবে।

সংগঠনের আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা দেখছি পাঁচটি উপাদানের ভিত্তিতে সংগঠন চলে। যথাঃ (i) একক উদ্দেশ্য (ii) নেতৃত্ব (iii) কর্মীবাহিনী (vi) কর্মসূচী ও (v) প্রয়োজনীয় অর্থ। সংগঠনের এই পাঁচটি মৌলিক উপাদানের এক বা একাধিক উপাদানে দুর্বলতা দেখা দিলেই সংগঠনে দুর্বলতা দেখা দিবে। তাই আমরা এক একটি উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখব কি ধরনের দুর্বলতা এক একটিতে সৃষ্টি হতে পারে।

(i) একক উদ্দেশ্য

আদর্শিক আন্দোলন ও সংগঠনে উদ্দেশ্যের ঐক্য গড়ে ওঠে আদর্শের ভিত্তিতে। তাই আদর্শের দিক থেকে কোন দুর্বলতা থাকলে সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে।

ইসলামী আদর্শের প্রবর্তক বিশ্ব স্রষ্ট মহান আল্লাহ তায়ালা। অহীর ভিত্তিতে রচিত আল কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতের সমষ্টিই হল ইসলাম। এর ভিতর নেই কোন দুর্বলতা, নেই কোন খুঁত বা ত্রুটি। কিন্তু এই আদর্শকে ভিত্তি করে যারা সংগঠনে শরীক হয় তাদের আদর্শকে গ্রহণ করা, মানা, বুঝা এবং প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

১. আদর্শ গ্রহণ ও মানার ক্ষেত্রে ত্রুটি

সাধারণভাবে মুসলমান সমাজ, বিশেষভাবে ইসলামী সংগঠনে জড়িত জনশক্তি ইসলামী আদর্শ গ্রহণ ও মানার ক্ষেত্রে ব্যাপক ত্রুটি বা দুর্বলতা প্রদর্শন করে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের সাথে সাথে অন্যান্য আদর্শ যেমন বস্তুবাদ, ভোগবাদ বা আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদকেও গ্রহণ করে এবং তার ভিত্তিতে

www.bjilibrary.com

জীবন পরিচালনা করে। কেউ বা ইসলামকে তার বিস্তৃত ময়দান থেকে গুটিয়ে গুটিকয়েক ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। কেউবা ইসলামকে কায়েমের জন্যে আল্লাহর পথে জিহাদের ধারণাকে পাল্টিয়ে কেবলমাত্র আত্মশুদ্ধির জিহাদ বা ব্যক্তিগত সংশোধনবাদে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। ফলে আদর্শের মাধ্যমে যে একক উদ্দেশ্য সৃষ্টি হওয়ার কথা- সে একক উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয় না। এমনিভাবে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যায়।

২. আদর্শ বুঝা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে ত্রুটি

আদর্শ গ্রহণ ও মানার ক্ষেত্রে যা ত্রুটি তা আসলে হয়ে থাকে আদর্শকে সঠিকভাবে বুঝা ও অনুধাবন না করারই কারণে। মুসলিম সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী অধঃপতনে আজ পতনোন্মুখ। সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা, আলেম-ওলামা পর্যন্ত কুরআন-হাদীস অধ্যয়নে অনভ্যস্ত। সর্বত্র কুরআন-হাদীসের গভীর চর্চার অভাব। ফলে কুরআন-হাদীসের মূল স্পিরিট থেকে মুসলমান সমাজ চলে এসেছে বহু দূরে। কুরআন-হাদীসকে সমাজে বাস্তবায়নের মহান শ্লোগান নিয়ে কাজ করার বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামী সংগঠনে জড়িত ব্যক্তিবর্গও সম্পূর্ণ সজাগ নন। যারা আন্দোলন ও সংগঠনে লেগে আছেন তাদেরও অনেক সময় দেখা যায় দায়সারা গোছের ভাবে লেগে আছেন। সংগঠনের নেতার নিকট আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত উপলব্ধি করেন না অনেকে।

৩. আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্পের ত্রুটি

আদর্শ গ্রহণ, মানা ও বুঝার ত্রুটির কারণেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প ইসলামী সংগঠনের জনশক্তির মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার কথা সে সংকল্প সৃষ্টি হচ্ছে না। আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগঠনের জনশক্তির মধ্যে এক অদম্য সংকল্প এবং তদনুযায়ী চেষ্টা সাধনা সৃষ্টি হওয়া দরকার। কিন্তু জনশক্তির বোধশক্তি যেন তেমন তীব্র নয়, অনেকটা যেন ভোতা। যার ফলে জনশক্তির মধ্যে কোন সংকল্পেরই সৃষ্টি হচ্ছে না। কাজ করে যাওয়া দরকার তাই কাজ হচ্ছে রুটিন মাফিক। ইসলামী বিপ্লব কোন রুটিন ওয়ার্কের ফলাফল নয়। এর জন্যে প্রয়োজন মজবুত সংকল্প ও কঠোর সাধনার। জনশক্তির মধ্যকার এ ত্রুটি খুবই মারাত্মক ত্রুটি। এ ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে না পারলে সংগঠনের দুর্বলতা দূর করা যাবে না।

(ii) নেতৃত্ব

ইসলামী সংগঠনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব শুধু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নয় বরং কেন্দ্র থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ইউনিট পর্যন্ত যে নেতৃত্বের সিলসিলা রয়েছে এই গোটা নেতৃত্ব কাঠামোকেই বুঝায়। কোন আন্দোলন বা সংগঠনে নেতৃত্বই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। নেতৃত্বই আন্দোলনের ডাক দেয়, সাড়াদানকারী জনশক্তিকে সংগঠিত করে, তাদের মান উন্নত করে আন্দোলনে গতি ও আবেগ সৃষ্টি করে। সংগঠনে নেতাকে ইঞ্জিনের ভূমিকা পালন করতে হয়। ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়লে যেমন গাড়ীই হয়ে পড়ে অচল,

www.bjilibrary.com

তেমনি নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে গোটা আন্দোলনই থেমে যায়। সংগঠনও হয়ে যায় লণ্ডভণ্ড। তাই নেতৃত্বের স্বয়ংক্রিয়তা, সক্রিয়তা ও উদ্যোগী ভূমিকা সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি। ফলে এ উপাদানে দুর্বলতা সৃষ্টি হলে সংগঠন দুর্বল হবেই। এ পর্যায়ে কি কি ধরনের দুর্বলতা আসতে পারে আলোচনা করে দেখা যাক।

১. নেতৃত্বের মধ্যে উদ্যোগের অভাব

নেতৃত্ব মানেই উদ্যোগী ভূমিকা। ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে দা'য়ী ইলাল্লাহর অগ্রণী ভূমিকা নিয়েই কাজ শুরু করতে হয়। সর্বস্তরেই এ উদ্যোগী ভূমিকা প্রয়োজন। যেখানে নেতৃত্বের মধ্যে এই উদ্যোগী ভূমিকা নেই সেখানেই দেখা দেয় নেতৃত্বের দুর্বলতা। এ দুর্বলতা গোটা সংগঠনকেই দুর্বল করে রাখে।

২. যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতার অভাব

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের জন্যে বিভিন্নমুখী যোগ্যতার প্রযোজন। যে কোন পর্যায়ে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যোগ্যতার কমতি থাকলে সংগঠনে বিভিন্নমুখী জটিলতা সৃষ্টি হয়। যোগ্যতার অভাবের কারণে যেমন সংগঠনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তেমনি যোগ্যতা মোটামুটি থাকা সত্ত্বেও কর্মতৎপরতার অভাব থাকলেও দুর্বলতা দেখা দেয়। নেতা যদি হয় নিষ্ক্রিয় তবে সংগঠন কিভাবে চলতে পারে? তাই যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতার অভাব সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩. মনযোগ ও সময়ের অভাব

সংগঠন চায় সংগঠনের প্রতি নেতার পূর্ণ মনযোগ। পূর্ণ নিষ্ঠা ও মনযোগসহ নেতা সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলে সংগঠন মজবুত হবে স্বাভাবিকভাবেই। এর জন্যে নেতাকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। নেতা যদি তার সময়ের বেশীর ভাগই নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সংগঠনের দাবী পূরণ নাও হতে পারে। তাই নেতার পক্ষ থেকে সংগঠনের প্রতি যদি পূর্ণ মনযোগ দেয়া না হয় এবং নেতার প্রয়োজনীয় সময় যদি সংগঠনের কাজে না আসে তাহলে সংগঠনে দুর্বলতা দেখা দিবে।

৪. সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রতি নজর না দেয়া

নেতাকে আন্দোলন ও সংগঠনের কাজের সকল দিকের সকল বিষয়ের প্রতি পূর্ণ নজর রাখতে হয়। এটা নেতৃত্বের এক পবিত্র দায়িত্ব। বাড়ীর কর্তাকে যেমন বাড়ীর সকলের সকল বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয় তেমনি নেতাকেও হতে হয় সজাগ। যিনি সফলভাবে পরিবারের সকল বিষয়ের খেয়াল ও তদারক করেন তিনিই যেমন আদর্শ কর্তা-তেমনিভাবে সংগঠনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে যে নেতৃত্ব খবরদারী করেন তিনিই আদর্শ নেতা। কোন নেতা এ ধরনের খেয়াল খবর না রাখলেই সংগঠনে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। তাই সংগঠনে দুর্বলতার একটি অন্যতম কারণ সংগঠনের কাজের সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রতি নেতার নজর না রাখা।

www.bjilibrary.com

৫. পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ না করা

সংগঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যেমন নেতৃত্বের অন্যতম দায়িত্ব, তেমনি নেতার ব্যক্তিগত কাজও হওয়া দরকার পরিকল্পনা ভিত্তিক। যে নেতা পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ করতে পারে না, পরিকল্পনা বাস্তবায়নও তার দ্বারা সম্ভব নয় এবং এমতাবস্থায় সংগঠনে মারাত্মক ত্রুটি ও অব্যবস্থা দেখা দেয়। তাই পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ না করা সংগঠনের একটি দুর্বলতা।

৬. গুছিয়ে কাজ করতে না পারা

নির্দিষ্ট পদ্ধতির ভিত্তিতে কাজকে সুষ্ঠুভাবে গুছিয়ে করতে হবে অর্থাৎ কাজের মধ্যে শঙ্খলা বজায় থাকবে। বৈঠক পরিচালনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রশ্ন রয়েছে, সপ্তাহের বৈঠকসমূহের ব্যাপারে শৃঙ্খলার প্রশ্ন আছে। এইভাবে সমস্ত ব্যাপারে কাজসমূহকে নির্দিষ্ট পদ্ধতির ভিত্তিতে গুছিয়ে আঞ্জাম দিতে না পারা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি বিরাট দুর্বলতা।

৭. দায়িত্ব পালনে অমনোযোগিতা বা অবহেলা

নেতৃত্বের কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলো তাদেরকেই আঞ্জাম দিতে হয়। যেমন বৈঠক ডাকা, বৈঠকে অধঃস্তন সংগঠন থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বুঝে নেয়া, রিপোর্ট পর্যালোচনা, অধঃস্তন সংগঠনের তদারক, প্রাপ্তব্য জিনিষের তাগিদ তলব ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্বশীলকে অবশ্যি সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে। অন্যথায় সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই দায়িত্বশীলের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা বা অবহেলা সংগঠনে দুর্বলতার একটি বড় কারণ।

৮. অধঃস্তন সংগঠনের দায়িত্বশীলের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্কের দুর্বলতা

অধঃস্তন সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট থেকে কাজ আদায় করা নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ব্যাপারে তাকে অধঃস্তন সংগঠনের দায়িত্বশীলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। মাসিক বৈঠকে অধঃস্তন দায়িত্বশীলের যোগদান এবং বিশেষ খবরাখবরের মাধ্যমে এ সম্পর্ক সর্বদা চালু থাকে। এ সম্পর্কের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলে সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

৯. সহকর্মী ও অধীনস্থদের সাথে সু-সম্পর্ক না থাকা

ইসলামী আন্দোলনে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও আন্তরিক হবে এটাই স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম হলেই সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে বুঝতে হবে। নেতৃত্ব ও সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয় সাধারণতঃ কয়েকটি কারণে ঃ

ক. দায়িত্বশীলের কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার, সহকর্মী বা অধঃস্তন দায়িত্বশীলের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা, এর জন্যে কর্কশ ভাষায় আজে বাজে মন্তব্য করার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে কষ্ট পেলে সম্পর্কের অবনতি হবে। এতে করে সংগঠনে দুর্বলতার যে বীজ বপন করা হল

www.bjilibrary.com

ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়তে পারে।

খ. পারস্পরিক পরামর্শ ছাড়া নেতা একা একা কাজ-কর্ম করতে থাকলেও সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সহকর্মীগণ কাজে কোন উৎসাহ পায় না এবং মনের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা নিয়ে কাজ করতে পারে না। ফলে সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে একটি চাপা ক্ষোভ বিরাজমান থাকে। এতে সংগঠনে দুর্বলতা দেখা দেয়।

গ. কারো ব্যাপারে কোন মোহাসাবা থাকলে তা নিয়মমাফিক সমাধা না করলেও জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। উল্টাপাল্টা মোহাসাবার কারণে সংগঠনের আভ্যন্তরণী পরিবেশটাই হয়ে উঠতে পারে ভারী। নেতৃত্বের যথার্থ ভূমিকা না থাকলে সংগঠনের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। সহকর্মী ও অধীনস্থ দায়িত্বশীল ও কর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক না থাকলে সংগঠনে মৌলিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

১০. সহকর্মীদেরকে তৈরী ও বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে না পারা

নেতৃত্বের একটি বিশেষ কাজ হলো সহকর্মীদিগকে কাজে লাগানো, তাদের মান উন্নত করা এবং তাদেরকে গড়ে তোলার সাথে সাথে তাদের মধ্য থেকে যোগ্যতর ব্যক্তিকে নেতৃত্বের দায়িত্বে বসানোর জন্যে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা। কোন নেতা যদি এ কাজটি করতে না পারেন তবে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা ব্যর্থ। তাই সহকর্মীদেরকে গড়ে তোলা এবং বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে না পারা সংগঠনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি বিরাট দুর্বলতা।

(iii) কর্মীবাহিনী

সংগঠনের তৃতীয় উপাদান কর্মীবাহিনী। কর্মীবাহিনীই সংগঠনের প্রাণ। একটি সদাসতর্ক ও সদাতৎপর কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের কাজ এগিয়ে যেতে পারে দ্রুত গতিতে। আর উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন, অযোগ্য ও কর্মবিমুখ একটি কর্মীবাহিনী আসলে কোন কর্মীবাহিনীই নয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর সংগী সাথীরা যেমন তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি এবং তোমার খোদা যাও লড়াই করগে, আমরা তো এখানে বসলাম"- এমন কর্মীবাহিনী দ্বারা সংগঠনের কোন ভবিষ্যত নেই। এ ব্যাপারে যেসব বিষয়ে দুর্বলতা আসতে পারে তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. আদর্শের জ্ঞানের অভাব, সংগঠনের দাবী না বুঝা

কর্মীদের মধ্যে আদর্শের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে কর্মীর দায়িত্ব সম্পর্কে তারা সজাগ নন। আসলে একামতে দ্বীনের দায়িত্ব মুসলমানদের জন্যে একটি অপরিহার্য ফরজ- এ বিষয়টি আজকের মুসলমান এবং আমাদের কর্মীদের নিকট সুস্পষ্ট নয়। যারা আন্দোলনে শরীক হয়েছেন তারাও এটাকে নফল হিসাবে পালন করার চেষ্টা করেন। ফলে কর্মীদের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা, তৎপরতা ও প্রাণচাঞ্চল্য পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাচ্ছে না। সংগঠনের দৃষ্টিতে এ এক বিরাট দুর্বলতা।

www.bjilibrary.com

২. গভীর ও আন্তরিক পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব

কর্মীদের মধ্যে গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক সংগঠন মজবুত করণের এক বিরাট শক্তি। ভালবাসা ও মহব্বত ছাড়া এ শক্তি অন্য কোনভাবে অর্জন করা যায় না। কর্মীদের মধ্যে সেই ধরনের মজবুত সম্পর্ক না থাকা সংগঠনের দুর্বলতার লক্ষণ। সংগঠনের জন্যে এ একটি মৌলিক দুর্বলতা।

৩. কর্মীদের মধ্যে টীম স্পিরিটের অভাব

সংগঠনের একেক পর্যায়ের কর্মীগণ বা একেক এলাকার কর্মীগণ এক একটি টীম। তাদেরকে টীম স্পিরিট নিয়ে কাজে নামতে হবে। টীম স্পিরিট নিয়ে কাজে নামতে পারলেই কাজে গতি সৃষ্টি হবে। কর্মীদের মধ্যে টীম স্পিরিটের অভাব সংগঠনের একটি বিশেষ দুর্বলতা।

৪. যথারীতি কর্ম বন্টন না হওয়া

কর্মীকে তার যোগ্যতানুসারে কাজ ভাগ করে দিতে হবে। কর্মীদের মধ্যে কর্মবন্টন না হলে কর্মীগণ যথারীতি কাজে মনযোগী হতে পারে না এবং সংগঠনের কাজে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

৫. কর্মীদের মান বৃদ্ধি না পাওয়া

কর্মীদের মধ্যে থেকেই রুকন ও দায়িত্বশীল সৃষ্টি হয়। এ জন্যে প্রয়োজন কর্মীদের মান ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা। কর্মীদের মান যদি মোটেও বৃদ্ধি না পায় তাহলে বুঝা যায় সংগঠনের কাজ যথারীতি চলছে না অর্থাৎ সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

(iv) কর্মসূচী

সংগঠনের চতুর্থ উপাদান কর্মসূচী। জামায়াতে ইসলামীর চার দফা স্থায়ী কর্মসূচী রয়েছে। সংগঠনের কর্মসূচী সংক্রান্ত দুর্বলতা কি কি আসতে পারে নিম্নের আলোচনায় আমরা তা দেখব।

১. দায়িত্বশীলগণ কর্তৃক কর্মসূচীকে ভাল করে না বুঝা

দায়িত্বশীলগণের মধ্যে অনেকেই চার দফা কর্মসূচীকে সঠিক ও যথার্থভাবে বুঝার চেষ্টা করেন না।

ক. দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশ্বাসী সাধারণ মুসলমান, শিক্ষিত জনগণ এই বিভিন্ন স্তরের লোককে বিভিন্ন ধরনের দাওয়াত পেশ।

খ. সাড়া প্রদানকারীদেরকে সংগঠনভুক্তকরণ ও প্রশিক্ষণ দান এবং মান মোতাবেক গড়ে তোলা।

গ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও সমাজসেবা।

ঘ. রাষ্ট্রীয় সংশোধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ময়দানে সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েম।

www.bjilibrary.com

এই দফাগুলো সঠিকভাবে বুঝে সবগুলির যথার্থ গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব পালন না করলে সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে।

২. চার দফা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে ভারসাম্য না রাখা

সংগঠনের জনশক্তি ও অর্থশক্তির মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচীতে চারটি দফায় ভারসাম্য না থাকলে সংগঠনের কাজে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো দায়িত্বশীলের মধ্যে কতক অতি সাংগঠনিক আবার কতক অতি রাজনৈতিক। সাংগঠনিক চরিত্রের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক কাজকর্মকে অযথা হৈ চৈ এবং বাজে কাজ মনে করেন, আবার রাজনৈতিক চরিত্রের দায়িত্বশীল সাংগঠনিক এইসব খুঁটিনাটি কাজকে অহেতুক পোকাবাছার কাজ মনে করেন। সংগঠনের প্রয়োজনে এ দুই চরিত্রের দায়িত্বশীলকেই সমন্বয়কারীর ভূমিকায় আসতে হবে। এভাবে কাজ ভারসাম্য আনতে না পারা সংগঠনের জন্যে দুর্বলতা।

৩. কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে বায়তুলমাল সংগ্রহ করতে না পারা

কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে বায়তুলমাল প্রয়োজন। তাই বায়তুলমাল সংগ্রহকরণের পদক্ষেপও সংগঠনকেই নিতে হবে। কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় বায়তুলমাল সংগৃহীত না হওয়া সংগঠনের একটি বিশেষ দুর্বলতা।

৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়া

চার দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি বিশেষ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়া মানে সংগঠনের একটি দুর্বলতা।

(v) প্রয়োজনীয় অর্থ

১. প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ঃ

সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন অর্থের। অর্থ ছাড়া কোন কর্মসূচীই বাস্তবায়িত করা যায় না। যে সংগঠনের মধ্যে অর্থের কোন ব্যবস্থা নেই বা অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে রয়েছে যথেষ্ট দুর্বলতা, সে সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই একটি দুর্বল সংগঠন।

২. অর্থের নিয়মিত উৎসের অভাব ঃ

সংগঠনের কোন না কোন নিয়মিত অর্থের উৎসের প্রয়োজন। কোন রকম নিয়মিত উৎস না থাকা মানে অর্থপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা। অনিশ্চিত অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে কোন সংগঠন ভালোভাবে চলতে পারে না। তাই অর্থের নিয়মিত উৎসের অভাব মানে সংগঠনের দুর্বলতা।

সংগঠনের দুর্বলতা কোন কোন দিক থেকে এবং কি কি ভাবে আসতে পারে আমরা আলোচনা করে দেখলাম। আমাদের আলোচনার ১ম উপাদানে ৩টি, ২য় উপাদানে ১০টি, ৩য় উপাদানে ৫টি, ৪র্থ উপাদানে ৪টি এবং ৫ম উপাদানে ২টি

www.bjilibrary.com

সর্বমোট ২৪টি কারণ ধরা পড়লো। হয়ত আরো ২/৪ টা কারণ থাকতে পারে। তবে এই ২৪টি দুর্বলতার দিক ঠিক করে সংগঠনকে দাঁড় করতে পারলে সংগঠনে মজবুতি আসবে আশা করা যায়। সামনে আমরা সংগঠনের মজবুতি আসবে কিভাবে এ বিষয়ে আলোচনা রাখব।

সংগঠনের মজবুতি আসবে কিভাবে ঃ

সংগঠনের দুর্বলতা যেমন সংগঠনের উপাদানের মাধ্যমে সংগঠনে আত্মপ্রকাশ করে তেমনিভাবে সংগঠনের মজুবতিও তার উপাদানের মাধ্যমেই আসবে। মনে রাখতে হবে সংগঠনের পাঁচটি উপাদানের মধ্যে উদ্দেশ্যের ঐক্য ও কর্মসূচী ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জিনিষ। তাই নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। সংগঠনের মজবুতিও আসে এ দুই উপাদানের মাধ্যমে, দুর্বলতাও সৃষ্টি হয় এ দুইয়ের কারণে। সংগঠনের মজবুতি আমাদের কাম্য। মজবুতি আনতে হলে দুর্বলতার কারণগুলো দুর করতে হবে। দুর্বলতা দূর করে সাথে সাথে যেসব পদক্ষেপ নিলে সংগঠন মজবুত হবে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. উদ্দেশ্যের ঐক্য সাধন আদর্শকে পূর্ণভাবে গ্রহণ

ইসলামী আন্দোলনের জন্যে গঠিত সংগঠনের গোটা জনশক্তির একটি উদ্দেশ্য- আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জন। এ উদ্দেশ্যের ধারণাকে সুস্পষ্ট করার জন্যে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক অধ্যায়ন ও পর্যালোচনার দরকার। গোটা জনশক্তি যদি এ ব্যাপারে তৎপর হন তবে আদর্শকে যেমন যথার্থভাবে গ্রহণ করা যাবে তেমনি উদ্দেশ্যের ঐক্যও সৃষ্টি হবে।

এর সাথে আদর্শকে যেমন গ্রহণ করতে হবে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে তেমনি বাস্তব জীবনেও আদর্শকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।

২. আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা

সংগঠনে অংশগ্রহণকারী জনশক্তিকে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে তুলতে হবে এবং চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংকল্পের দৃঢ়তা এবং চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা কামিয়াবীর এক মজবুত শর্ত। সংগঠনের জনশক্তিকে এ ব্যাপারে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের একটি জনশক্তি সংগঠনের মজবুতির প্রথম সোপান।

৩. উদ্যোগী নেতৃত্ব বা নেতৃত্বের উদ্যোগী ভূমিকা

সংগঠনের মজবুতির জন্যে উদ্যোগী নেতৃত্ব অথবা নেতৃত্বের উদ্যোগী ভূমিকা অপরিহার্য। উদ্যোগী নেতৃত্ব যখন সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সংগঠন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নেতা যখন অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যান, সংগঠনও তখন হয়ে ওঠে

www.bjilibrary.com

বেগবান। স্বয়ংক্রিয় ও সক্রিয় নেতাই সংগঠনের পরিচিতি এনে দেয়। তাই, সংগঠনের মজবুতির জন্যে উদ্যোগী নেতৃত্ব হলো প্রধান হাতিয়ার।

৪. কর্মতৎপর ও যোগ্য নেতৃত্ব

নেতৃত্বকে হতে হবে কর্মতৎপর, কর্মচঞ্চল, দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন, দায়িত্ব পালনকারী এবং সাথে সাথে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতৃত্ব হয়ত অনেক সময় পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইসলামী সংগঠন পরিচালনার জন্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই নেতৃত্বের দায়িত্বে বসাতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন ও কর্মতৎপর নেতৃত্ব সংগঠনের মজবুতি বয়ে আনবে আশা করা যায়।

৫. সংগঠনের প্রতি মনোযোগ ও সময় দান

যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্ব যদি সংগঠনের প্রতি যথার্থ মনোযোগ দেন, সংগঠন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, সংগঠনের অগ্রগতির জন্যে পেরেশানী অনুভব করেন তাহলে সংগঠন মজবুতির দিকে ধাপে ধাপে এগুবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য মনোযোগের সাথে সাথে সংগঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় সময়ও দিতে হবে। নেতৃত্বকে যেভাবেই হোক প্রয়োজনীয় সময় বের করতেই হবে।

৬. সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রতি খেয়াল রাখা

নেতাকে অবশ্যি সংগঠনের সার্বিক দিক ও বিভাগের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সংগঠনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারও নেতৃত্বের জন্যে থাকবে এবং সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধানের যেমন সে ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, তেমনি নেতাকেও সংগঠনের ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। সংগঠনের মজবুতির জন্যে নেতার এ ধরনের সার্বিক দায়িত্ব পালন জরুরী।

৭. পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ আঞ্জাম দান

নেতাকে পরিকল্পনা মাফিক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যেমন খেয়াল থাকবে নেতার, তেমনি তার নিজের কাজও হবে পরিকল্পনামাফিক। সংগঠনের মজবুতির ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা মাফিক কাজ ফলপ্রসূ হবে।

৮. শৃংখলা মোতাবেক গুছানো কাজ

সংগঠনের মজবুতির জন্যে সংগঠনের প্রতিটি কাজই হওয়া দরকার সাজানো-গুছানো ও শৃংখলা মোতাবেক। বিশৃংখল কাজে কোন বরকত নেই। যে কোন কাজেরই পূর্ব পরিকল্পনা থাকবে, দায়িত্ব ভাগ-বন্টিত থাকবে এবং সুষ্ঠু পরিচালনা থাকবে আর প্রোগ্রাম শেষে প্রয়োজন বোধে তার পর্যালোচনা হবে। এমনি শৃংখলা মোতাবেক কাজ হলে সংগঠনের মজবুতি না এসে পারে না।

www.bjilibrary.com

৯. দায়িত্ব পালনে দায়িত্বশীলের সতর্কতা ও মনোযোগ

সংগঠনের বিভিন্নমুখী দায়িত্ব দায়িত্বশীলের পালন করতে হয়। সকল ব্যাপার দায়িত্বশীলকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে এবং যথারীতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। বৈঠকাদি ডাকা, যথাসময়ে বৈঠক শুরু করা এবং যথারীতি পরিচালনা, অধঃস্তন সংগঠনের যথারীতি তদারক, রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা, অধঃস্তন সংগঠনের মাসিক রিপোর্ট ও নেছাব যথাসময়ে আদায় ইত্যাদি সকল বিষয়ে দায়িত্বশীলকে খেয়াল রাখতে হবে। এমনিভাবে খেয়াল রেখে নেতৃত্ব যদি দায়িত্ব পালন করেন, তবে সংগঠনের মজবুতি অনিবার্য।

১০. অধঃস্তন সংগঠনকে সক্রিয় ও সচল রাখা

সংগঠন হলো একটি চেইন ওয়ার্ক অর্থাৎ এক স্তরের সাথে অন্য স্তরের কাজ সম্পর্কিত। উর্ধতন সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব হলো নিম্নস্থ সংগঠনের দায়িত্বশীলকে সর্বদা চাঙ্গা করে রাখা, কাজ করানো, রিপোর্ট আদায় ইত্যাদি। উর্ধতন দায়িত্বশীল নিম্নস্থ দায়িত্বশীলের কাজ (ক) তদারক করবেন, ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেবেন, ঠিকভাবে কাজ করার তরীকা বাৎলে দেবেন; (খ) কাজের রিপোর্ট নেবেন, যথাযথ রিপোর্ট যাতে আসে সেদিকে খেয়াল রাখবেন ও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট নেবার চেষ্টা করবেন; (গ) রিপোর্টের যথাযথ পর্যালোচনা করবেন, ত্রুটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন (ঘ) কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করবেন। নতুন দায়িত্বশীলকে হাতে-কলমে রিপোর্ট তৈরী, বৈঠক পরিচালনা এসব শিখাতে হয়-এভাবে সহযোগিতা করবেন। এভাবে নিম্নস্থ সংগঠনের সাথে বিভিন্ন কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে নিম্নস্থ সংগঠনকে সক্রিয় ও সচল করে তুলতে হবে এবং চালু রাখতে হবে। একটি জীবন্ত ও মজবুত সংগঠনের নমুনাই এরূপ।

১১. সহকর্মী ও নিম্নস্থ দায়িত্বশীলদের সাথে গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক থাকা

সংগঠনের মজবুতির আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নেতৃত্বের এবং কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক। নেতাকে যদি কর্মীগণ অন্তর দিয়ে ভালবাসেন তাহলেই তো তিনি ইসলামী সংগঠনের সত্যিকার নেতা। এক্ষেত্রে নেতাকে যেসব গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে পূর্বে তার আলোচনা হয়েছে, এখানে সংক্ষেপে পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছি। তার ব্যবহার মন আকর্ষণকারী হতে হবে, পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে, প্রয়োজনবোধে নিয়ম মাফিক মোহাসাবা করে সংগঠনের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুস্থ রাখতে হবে।

১২. লোক তৈরী করা ও বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি

সংগঠনের মজবুতি নির্ভর করে বেশী বেশী দায়িত্বশীল লোক তৈরীর উপর। কোন নেতৃত্ব যদি তার অধীনে নতুন লোক তৈরী করতে পারেন তাহলে সংগঠন মজবুতির পক্ষে এগুচ্ছে বুঝায়। এমনিভাবে কোন দায়িত্বশীল যদি তার

www.bjilibrary.com

স্থলাভিষিক্ত তৈরী করতে পারেন তাহলে তা তার সাফল্য। এমতাবস্থায় বুঝা যায় সংগঠনের মজবুতি এসেছে। কেননা, বর্তমান দায়িত্বশীল না থাকলেও সংগঠন যথারীতি চালু থাকবে।

১৩. স্বতঃস্ফূর্ত ও কর্মতৎপর কর্মীর সমাবেশ

সংগঠনের গতি আনে কর্মীবৃন্দ। সংগঠনের মজবুতি অনেকখানি নির্ভর করে কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকার উপর। নেতার অঙ্গুলী নির্দেশে কর্মীবৃন্দ যদি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তৎপরতা পূর্ণোদ্যমে অব্যাহত রাখেন, তাহলে সংগঠন হয়ে ওঠে জীবন্ত, আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। কর্মীদেরকে কর্মঠ ও বিরামহীনভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কাজ কোন মওসুমী কাজ নয়, এ কাজ সর্বক্ষণের। সাহাবায়ে কেরামের উদাহরণকে সামনে রেখে কর্মীদেরকে তাদের ভূমিকা রাখতে হবে।

১৪. কর্মীদের মধ্যে টীম স্পিরিট তৈরী

কর্মীদের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে একটি Team spirit গড়ে তুলতে হবে। এ যেন একটি মেশিন। মেশিনের যেমন সবগুলো কলকব্জা একযোগে কাজ শুরু করে এবং একটি অপরটির সহায়তা করে তেমনি সংগঠনের কর্মীদেরকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। এমনি Team spirit নিয়ে কাজ করলে বুঝা যাবে সংগঠনে মজবুতি এসেছে।

১৫. যোগ্যতার সাথে স্ব স্ব কাজ করা ও মান বৃদ্ধি

কর্মীদের প্রত্যেককে সংগঠন কর্তৃক দেয়া স্ব স্ব কাজ যোগ্যতার সাথে পালন করতে হবে। সংগঠন পূর্ব থেকেই প্রত্যেক কর্মীকে তার যোগ্যতানুযায়ী কাজ বন্টন করে দেবে। কর্মীগণ স্ব স্ব ময়দানে যোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মীমান বৃদ্ধির জন্যে সচেষ্ট থাকবেন। কর্মী থেকে অগ্রসর কর্মী ও রুকন হবেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এমনিভাবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন ও মান বৃদ্ধি পেলে সংগঠনের মজবুতি আশা করা যায়।

১৬. নেতা ও কর্মীগণ কর্তৃক কর্মসূচী ভাল করে বুঝে কর্মসূচী আঞ্জাম দান

দায়িত্ব পালন ও কাজ করার জন্য কর্মসূচীকে ভাল করে বুঝে নিতে হবে। চারটি দফার কাজকে একই সাথে একযোগে পরিচালনা করতে হবে। দাওয়াতের ফলাফল সংগঠনে অধিক লোক যোগদানের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটাতে হবে। সংগঠনে যোগদানকারী লোকদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সংগঠিত জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। সংগঠিত জনশক্তি দ্বারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটানো এবং অধিক পরিমাণে সমাজসেবার কাজ করাতে হবে। সাথে সাথে চলমান রাজনৈতিক ময়দানে যথার্থ ভূমিকা রাখতে হবে। এমনিভাবে চার দফা কাজের ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত কাজের আঞ্জাম দিতে হবে।

www.bjilibrary.com

১৭. পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

চার দফা কাজকে সামনে রেখে পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কেন্দ্র থেকে ইউনিট পর্যন্ত যথার্থ পরিকল্পনা নিতে হবে এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে যথারীতি পর্যালোচনা ও নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে। এমনিভাবে পরিকল্পনা মাফিক ধাপে ধাপে কাজ এগিয়ে নিতে পারলে সংগঠনের মজবুতি আসবে।

১৮. প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ

সংগঠনের মজবুতি আনতে হলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সংগঠনের ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে সংগঠনে জড়িত ব্যক্তিবর্গকেই। তারা তাদের সাধ্যমত আল্লাহর পথে দানে অংশগ্রহণ করবেন। সহযোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করবেন, আন্দোলনের শুভাকাঙ্খী মহল থেকে অর্থ সংগ্রহ করবেন। জাকাত, ওশর, মওশুমী কালেকশন ইত্যাদির মাধ্যমে এক মজবুত বায়তুলমাল গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে বায়তুলমালের যথাযথ ব্যবহারও করতে হবে। বাজেটের খাত অনুযায়ী হিসাব করে খরচ করতে হবে। বায়তুলমালের যথাযথ হিসাব নিকাশ রাখতে হবে।

উপরে যেসব পয়েন্ট আলোচনা করা হল, সেভাবে সংগঠনকে গড়ে তুলতে পারলে এক মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা যাবে আশা করা যায়। এর জন্যে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। সংগঠনের দুর্বলতাগুলো দুর করে সার্বিকভাবে এক মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার মধ্যেই নির্ভর করে আন্দোলনের ভবিষ্যত।

সংগঠনের মজবুতির লক্ষণ ঃ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকলে বুঝা যাবে সংগঠনের মজবুতি রয়েছে এবং সংগঠন অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

১. চিন্তার ঐক্য

বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুর ব্যাপারে যদি ঐকমত্য দেখা যায় তাহলে বুঝা যাবে সংগঠনের মজবুতি রয়েছে। অবশ্য এ কথা দ্বারা এটা বুঝায় না যে, কোন ব্যাপারে কোন মতপার্থক্যই থাকবে না। মানুষের সংগঠনে মতপার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচনান্তে যে ফয়সালা হবে সে ফয়সালা যদি সবাই মেনে নেন তাহলেই চিন্তার ঐক্য রয়েছে বলে ধরা হবে।

২. সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার ত্বরিৎ বাস্তবায়ন

কোন ইস্যু আসলে যথারীতি সে ব্যাপারে ফায়সালা দিতে হবে এবং ফায়সালা মোতাবেক ত্বরিৎ পদক্ষেপ নিতে হবে। সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের এ ধরনের ত্বরিৎ

www.bjilibrary.com

বাস্তবায়ন হলে বুঝা যাবে সংগঠন যথেষ্ট মজবুত। দুর্বল সংগঠনে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সাথে সাথে তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অথবা এ ধরনের ত্বরিৎ পদক্ষেপ সম্ভব না হলে তা মজবুত সংগঠন নয়।

৩. জনশক্তির ক্রম বৃদ্ধি

রুকন, কর্মী ও সহযোগী সদস্য যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহলে বুঝা যায় সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলছে। রুকন ও কর্মীদের মান যদি ঠিক থাকে তাহলে জনশক্তি বৃদ্ধি পাবেই আর যদি দেখা যায় রুকন ও কর্মী সংখ্যা বাড়ছে না তাহলে বুঝা যাবে মান ঠিক নেই। এমতাবস্থায় যথার্থ হিসাব নিলে দেখা যাবে, কিছু সংখ্যক কর্মী যথার্থ অর্থে কর্মী নেই।

৪. বায়তুলমাল বৃদ্ধি

সংগঠনের অগ্রগতি হলে বায়তুলমাল বৃদ্ধির মাধ্যমেও তা প্রকাশ পাবে। সংগঠনের অগ্রগতি মানে জনশক্তি বৃদ্ধি এবং জনশক্তি বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই বায়তুলমাল বেড়ে যাবে। তাই জনশক্তি ও বায়তুলমাল বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগঠনের অগ্রগতি পরিস্কার ভাবে ধরা পড়বে।

৫. সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সুস্থ পরিবেশ

সংগঠনের মজবুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সকল পর্যায়ের জনশক্তির মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকার কারণে উন্নত মানের সম্পর্ক বজায় থাকা।এটা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুস্থ থাকার উপায়। যার ফলে টীম স্পিরিট গড়ে উঠে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়। অথবা এই সম্পর্ক ভাল থাকার কারণেই আভ্যন্তরীণ পরিবেশটি সুস্থ থাকে।

এসব বিষয়ের মাধ্যমে সংগঠনের মজবুতি এবং অগ্রগতির হার সহজেই নিরূপণ করা যায়।

www.bjilibrary.com

বিপ্লব সাধনে নিয়োজিত ইসলামী সংগঠনের রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্যে যে ইসলামী আন্দোলন চলবে তার জন্যে নিবেদিত থাকতে হবে একটি সংগঠন। সেই সংগঠনের রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ইসলামী আন্দোলনে সংগঠনের গুরুত্ব ঃ

ইতোপূর্বে সংগঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ের ভূমিকায় আরো কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন, "আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিষ রেখে যাচ্ছি - আল কুরআন ও আমার সুন্নাত - এ দু'টি জিনিষ আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কোনদিন গোমরাহ হবে না।" এ ব্যাপারে কথা হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআনের ভিত্তিতে ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে গিয়ে যে পথ, পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা-ও-তো সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে সংগঠন গড়ে তোলা এবং সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কর্মধারার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কুরআন পাকের সূরা বাকারার ১৫১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে কথা বলেছেন

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ-

(سورة البقرة : ١٥١)

অর্থ ঃ "যেভাবে আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের মাঝে একজন রাসূল যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা প্রদান করেন এবং তোমাদেরকে ঐসব বিষয় শিখান যা তোমরা জানতে না।"

(সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫১)

এর মধ্যে হিকমত ও যেসব কথা উম্মত জানত না তা শিক্ষা দেবার যে কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে সংগঠনের শিক্ষা যে রয়েছে তা সুস্পষ্ট। আভিধানিক অর্থেও হিকমত মানে কৌশল। রাসূল সংগঠনের হিকমত বা কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংগঠনের কৌশল শিক্ষা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। কুরআনকে বাস্তবায়িত করতে গেলে এ শিক্ষার বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এ

www.bjilibrary.com

থেকে ইসলামী আন্দোলনে সংগঠনের গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

জামায়াত বা সংগঠনের বাইরে থাকা যে আত্মঘাতী রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কয়েকটি হাদীসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক হাদীসে আল্লাহর নবী বলেন ঃ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً- (رواه مسلم)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করল এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।" (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী বলেন ঃ

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ سَدَّ شُذَّ اِلَى النَّارِ-

অর্থ ঃ "জামায়াতের প্রতি আল্লাহর হাত (রহমত), যে ব্যক্তি একাকী চলে, সে তো জাহান্নামের পথেই চলে।" (তিরমিযী)

তাই যারা ইসলামের প্রকৃত অনুসারী, তারা ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থাৎ একামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে অবশ্যি সংগঠনে শামিল হবে।

ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত সংগঠনের কাঠামো ও রূপরেখা সাধারণ সংগঠনের মতই হবে। এ সংগঠনে সংগঠনের সেসব উপাদানের উপস্থিতি থাকবে যা সাধারণ সংগঠনে থাকে। এখানেও থাকবে উদ্দেশ্যের ঐক্য, নেতৃত্বের ভূমিকা, অনুসারী দলের আনুগত্য ও একাগ্রতা, বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী, নির্ধারিত কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন ধারা, বায়তুল মাল বা ফান্ড গঠনের উদ্যোগ, তার ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নীতি। তবে ইসলামী সংগঠনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১. উদ্দেশ্যের ঐক্য ঃ

প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যের ঐক্যই একটি সংগঠনের মূল ভিত্তি। সংগঠন গঠনে আহ্বায়কের প্রধান ভূমিকা থাকে একথা ঠিক, কিন্তু কোন একটি উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সংগঠনে শামিল হওয়া এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারলে সংগঠন গড়ে তোলা যায় না। ঐক্যটাই আসলে সংগঠন। তাই সে ঐক্য কিসের ভিত্তিতে তা গুরুত্বপূর্ণ। ঐক্য যত মজবুত হবে, সংগঠন ততো মজবুত হবে।

ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত সংগঠন ও লোকদেরকে এ ঐক্যের ভিত্তিতেই সংগঠনে শামিল করবে। এ উদ্দেশ্যের চেতনা সুস্পষ্ট ও গভীর হলেই সে সংগঠন হবে মজবুত ও শক্তিশালী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তদানীন্তন আরবের লোকদেরকে একটি উদ্দেশ্যের দিকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্যটি ছিল এই যে, গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও গোলামী করা, একমাত্র তাকেই রব, মালিক, মনিব, আইন ও বিধানদাতা বলে মানা। ইহকালে তারই আইন মেনে ও দাসত্ব করে মানুষের ইহকালীন জীবনকে শান্তিময় ও

www.bjilibrary.com

সুখময় করা এবং আখিরাতের জিন্দেগীকে দোজখের আগুন তথা শাস্তি থেকে নিরাপদ করে চিরকালীন বেহেস্তের সুখ ও শান্তির উপযোগী করা। এ কাজের জন্য প্রয়োজন দ্বীনের একামত - একামতে দ্বীন। কেননা দ্বীন (ইসলাম) কায়েম থাকলেই মানুষের পক্ষে এভাবে চলা সম্ভব। কাজেই একামতে দ্বীনের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদের মধ্যেই রয়েছে মানুষের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর সেই সন্তুষ্টি অর্জনই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

জীবনের এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে আল্লাহ ছাড়া আর সকল প্রকার গোলামী ও দাসত্ব, তাগুত ও শয়তানের গোলামী, নফসের গোলামী, অর্থের গোলামী বাদ দিতে হবে। মানুষ খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও গোলামী করবে। এর জন্যে প্রয়োজন আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর অগ্রাধিকার দান। দুনিয়ার যিন্দেগীর ষোল আনা আদায় করে, নফ্সের সকল চাহিদা পূরণ করে আখিরাতের জন্য কোন- প্রকার ত্যাগ-কোরবানী করতে রাজী না হয়ে আল্লাহর দাসত্বের দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। আল-কুরআন ঘোষণা করে মানুষের যিন্দেগী তো আখিরাতেরই জিন্দেগী।

وَمَاهٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ، وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-

অর্থ ঃ "আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নহে, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের ঘরইতো আসল জীবন। যদি এরা তা জানতো।" (সূরা আন্কাবুত ঃ আয়াত ৬৪)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার গোটা নবুয়তি যিন্দেগীতে আখিরাতমুখী একদল মানুষ তৈরীরই চেষ্টা ও সাধনা করে গেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং আখিরাতের নাজাত লাভে প্রত্যাশী মানুষের যে সংগঠন তিনি গড়ে তুললেন তাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল। কুরআনের ভাষায় মুমিনের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসল ঃ

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-
(سورة الانعام : ١٦٢)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সব কিছুই কেবলমাত্র বিশ্বজগতের রব আল্লাহরই জন্য।" (সূরা আন্আম ঃ আয়াত ১৬২)

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে জীবনের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শাহাদাত অথবা দ্বীনের বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের জীবনের কাম্য ছিল। বস্তুগত স্বার্থ-চিন্তা, রাজনৈতিক সুবিধা লাভ, ক্ষমতার প্রাধান্য অর্জন,

www.bjilibrary.com

গোষ্ঠীগত সাফল্য– এসব কোনটাই তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের কার্যক্রম ছিল কুরআনের ভাষায় ঃ

একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের জন্যই। مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ–

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন মুক্তি লাভের জীবন-উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল একদল মানুষ নিয়ে যে সংগঠন গড়ে উঠল, সে সংগঠন হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন।

আজকেও ইসলামী আন্দোলনের জন্য তেমনি নিবেদিত প্রাণ একদল মানুষের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য এ এক অপরিহার্য শর্ত।

২. নেতৃত্বের ভূমিকা ঃ

ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের যথার্থ ভূমিকা তেমনি আরেকটি অপরিহার্য প্রয়োজন। আজকের ইসলামী আন্দোলন আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অতীতের ইসলামী আন্দোলনেরই নবায়ন মাত্র। তাই নেতৃত্বের পর্যায়ে অতীতের আন্দোলন থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি তা প্রথমেই লক্ষ্যণীয়।

নেতৃত্বের ভূমিকার ব্যাপারে আম্বিয়ায়ে কিরামের আন্দোলন থেকে আমরা যে সব শিক্ষা সাধারণভাবে পাই তা হল ঃ

ক. আম্বিয়ায়ে কেরাম সবাই ছিলেন দা'য়ী - (আহ্বায়ক)

উম্মতের লোকেরা নেতা নির্বাচন করে তাঁকে দায়িত্ব প্রদান করেননি বরং দায়িত্ব এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর তিনি আহ্বায়কের ভূমিকা নিয়ে মাঠে নেমেছেন। ডাক দিয়েছেন সমাজের লোকদেরকে। যারা সাড়া দিয়েছেন, তাদেরকে সংঘবদ্ধ করেছেন। আর যারা বিরোধিতা করেছে তাদের মোকাবেলায় ধৈর্যধারণ করেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতিটাই এই যে, আহ্বায়ক নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে এ কাজে। আজো কোন দেশের কোন এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে গেলে এমনি ধরনের উদ্যোগী ও অগ্রণী ভূমিকার লোকের প্রয়োজন।

খ. তারা যথার্থ নেতৃত্ব দান করেছেন–

শুধুমাত্র আহ্বায়কের ভূমিকা নয় আম্বিয়ায়ে কিরাম নেতৃত্বের গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন এবং তাঁরা যথার্থভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তারা বরং আনুগত্যের দাবী করেছেন। فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ "ভয় কর আল্লাহকে আর আনুগত্য কর আমার।" –এই ছিল নবীদের বক্তব্য। তাদেরই নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন মনযিলে মকসুদের দিকে এগিয়ে গেছে।

www.bjilibrary.com

গ. যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন–

বিভ্রান্ত মানুষের সামনে আল্লাহর তৌহিদের এবং দাসত্বের দাওয়াত প্রদানে সমাজে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে– নবী রাসূলগণ অম্লানবদনে সে সব পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, কোন নবীই নবুয়তের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করেননি বরং ধৈর্যের সাথে, সাহসিকতার সাথে সে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিরোধী শক্তি হয় দ্বীন কবুল করেছে অন্যথায় ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়েছে।

ঘ. নবীদের এ কাজ ছিল আমৃত্যু কাজ–

দায়িত্ব এসে যাওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে কোন নবীই অব্যাহতি লাভ করেননি। অবিরাম তাদেরকে কাজ করতে হয়েছে। বিরামহীনভাবে আল্লাহর দিকে তারা লোকদেরকে ডেকেছেন।

ঙ. তাঁরা ছিলেন স্বয়ংক্রিয় এবং সক্রিয় ও তৎপর–

আম্বিয়ায়ে কিরামকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়নি। দিতে হয়নি কোন প্রকার তাকিদ-তলব। বরং নবীগণ নিজেদের দায়িত্বানুভূতির কারণেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সদা-সর্বদা কাজে সক্রিয় ও তৎপর ভূমিকা রাখতেন।

চ. তারা ছিলেন নিঃস্বার্থ, নিজেদের আরাম-আয়েশের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন–

আম্বিয়াকে কিরামের নবুয়তের দায়িত্ব পালনের কাজে কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ-চিন্তা, প্রভাব বিস্তার, সুযোগ-সুবিধা লাভের কোন প্রশ্ন কখনো ওঠেনি। নবুয়তের দায়িত্বই ছিল তাদের কাছে প্রধান। ফলে বস্তুগত এইসব চাহিদা–প্রয়োজনের গুরুত্ব তাদের কাছে ছিল না মোটেও। কওমকে সংগঠিতকরণ, তাদের মানোন্নয়ন- এ সব নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকতেন। নবী চরিত্রের কারণেই তারা ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের প্রতিও ছিলেন ভ্রূক্ষেপহীন।

এসব সাধারণ গুণাবলী ছাড়া বিশেষ নবীর বিশেষ গুণের উল্লেখও পাওয়া যায় কুরআন পাকে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নেতৃত্বসুলভ গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে আল কুরআনে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সদাতৎপর, সাহসী নেতৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

إِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

অর্থ ঃ "হে ইব্রাহীম, আমি তোমাকে বিশ্ব মানবতার ইমাম বানিয়ে দিলাম।"

(সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৪)

www.bjilibrary.com

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ-

অর্থ ঃ "এ হলো তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত।" (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৭৮)

তিনি মহাপ্রভুর একের পর এক বহু রকম পরীক্ষায় সাফল্য জনক ভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই তাঁর ব্যাপারে এসব ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

হযরত নূহ (আঃ)

হযরত নূহ (আঃ)কে দেখা যায় অবিশ্রান্তভাবে প্রায় হাজার বছর ধরে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকতে। কতভাবে যে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন তার উল্লেখ রয়েছে আল কুরআনে। এভাবে একজন সফল দাওয়াত প্রদানকারীর চরিত্রের শিক্ষা পাওয়া যায় হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছ থেকে।

হযরত মুসা (আঃ)

আল কুরআন হযরত মুসা (আঃ) কে 'সুস্বাস্থ্যের অধিকারী' ও 'আমানতদার' বলে উল্লেখ করেছে। নেতৃত্বের জন্য এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণ অপরিহার্য। এছাড়া মুসা (আঃ) ফেরাউনের দরবারে দাওয়াত প্রদানে যাওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহর নিকট যে সব গুণ কামনা করেছেন তাও লক্ষ্যণীয় ঃ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْلِيْ صَدْرِيْ - وَيَسِّرْلِيْٓ اَمْرِيْ - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ - يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ- وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِيْ - هٰرُوْنَ اَخِيْ- (سورة طه : ٢٥-٣٠)

অর্থ ঃ "মুসা (আঃ) বললেন, হে আমার রব আমাকে সরহে সদর দান কর, আমার কাজকে সহজ করে দাও, আমার জিহ্বার জড়তাকে খুলে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে আর আমারই পরিবারের মধ্য থেকে আমার ভাই হারুনকে আমার সহকারী বানিয়ে দাও।" (সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ২৫-৩০)

তিনি চারটি ফরিয়াদ করলেন ঃ

১. সরহে সদর– দ্বীনের বুঝ-সমঝ পূর্ণভাবে দান কর;
২. কাজকে সহজ করে দাও;
৩. লোকেরা আমার বক্তব্য বুঝতে পারে এমনভাবে বলার যোগ্যতা দান কর;
৪. আমার কাজে সহযোগিতা করার দায়িত্ব আমারই ভাইকে প্রদান কর।

বনী ইসরাইলের নবী ঘোষিত বাদশার গুণ ঃ

আল কুরআনে বনী ইসরাইলী জনৈক নবী কর্তৃক ঘোষিত জনৈক বাদশা তালুতের গুণাবলী বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ- "জ্ঞানে ও স্বাস্থ্যে অগ্রগামী।"

এখানে নেতৃত্বের দু'টি গুণ পাওয়া গেলো ঃ

www.bjilibrary.com

১. জ্ঞানে - বিজ্ঞানে অগ্রগামী
২. শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্যে অগ্রগামী।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর নেতৃত্বের গুণাবলী ঃ

গোটা আল কুরআনেই রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্রের বর্ণনা। বলা হয় রাসূল ছিলেন জীবন্ত কুরআন। তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক থেকে নেতৃত্বের গুণাবলী তুলে ধরা যায়। নিম্নে তাঁর কতিপয় গুণাবলী উল্লেখ করা হল ঃ

اَنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا- وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا-

অর্থ ঃ আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীস্বরূপ। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার প্রতি আহ্বানকারী ও এক উজ্জ্বল প্রদীপ হিসাবে।" (সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

একটিমাত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলের এতগুলো গুণের কথা উল্লেখ করেছেন যা লক্ষ্য করার মত। দীর্ঘ ব্যাখার দাবীদার এ আয়াতে যে কয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা হলো ঃ

১. দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) সাক্ষ্যদানকারী।
২. দ্বীন গ্রহণকারীদের জন্য তিনি সুসংবাদ প্রদানকারী।
৩. দ্বীন অমান্যকারীর জন্য সতর্ককারী।
৪. আল্লাহর দিকে লোকদেরকে আহ্বানকারী।
৫. তিনি যেন এক উজ্জ্বল প্রদীপ।

সূরা তাওবার ১২৮নং আয়াত ও সূরা আলে ইমরানের ১৫৯নং আয়াতে রাসূলের (সাঃ) চরিত্রের যে দিকটির উল্লেখ হয়েছে তা হলো– তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারে খুবই দরদী। তিনি পাষাণ দিলসম্পন্ন কড়া মেজাজের লোক হলে লোকেরা তাঁর কাছেও ঘেঁষতো না।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এমনটা তার জন্য খুবই কষ্টকর। তোমাদের কল্যাণের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, ঈমানদারদের জন্য খুবই সংবেদনশীল ও দয়ালু।" (সূরা আত তাওবা ঃ আয়াত ১২৮)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ- (سورة العمران : ١٥٨)

www.bjilibrary.com

অর্থ ঃ "এটা আল্লাহ তায়ালার এক বিরাট মেহেরবানী যে, আপনি তাদের জন্যে খুবই নরম দিলের পরিচয় দিতে পেরেছেন, আপনি যদি কড়া মেজাজের পাষাণ দিলের মানুষ হতেন, তাহলে এরা আপনার পাশেও ঘেঁষতো না।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৮)

খোলাফায়ে রাশেদার নেতৃত্বের গুণাবলী ঃ

খোলাফায়ে রাশেদার খলিফাদের এক এক করে নেতৃত্বের গুণাবলী আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু আলোচনার কলেবর কমানোর জন্য এ সম্পর্কিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে যাতে নবী করীম (সাঃ)-এর জবানেই তাঁদের গুণাবলী জানা যায়। রাসূলের পরবর্তী নেতৃত্ব সম্পর্কে সাহাবাদের জিজ্ঞাসার জবাবে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اِنْ تُؤْمِنُوْا اَبَابَكْرٍ تَجِدُوْهُ اَمِيْنًا زَاهِدًا فِىْ الدُّنْيَا رَاغِبًا اِلَى الاٰخِرَةِ وَاِنْ تُؤْمِرُوْا عُمَرًا تَجِدُوْا قَوِيًّا اَمِيْنًا لاَيَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا عَلِيًّا وَلاَاَرَاكُمْ فَاعِلِيْنَ تَجِدُوْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا يَاْخُذُكُمُ الطَّرِيْقُ الْمُسْتَقِيْمَ-

অর্থ ঃ "যদি তোমরা আবু বকরকে আমীর বানাও, তাকে পাবে আমানতদার হিসেবে, দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট। যদি তোমরা উমরকে আমীর বানাও তাকে পাবে শক্তিশালী ও আমানতদার হিসেবে, সে আল্লাহর ব্যাপারে দুর্নাম বর্ণনাকারীর কোন পরোয়া করবে না। আর যদি তোমরা আলীকে আমীর বানাও, আমি মনে করি না তোমরা এরূপ করবে, তোমরা তাকে পাবে পথ প্রদর্শনকারী ও পথ প্রদর্শক ব্যক্তি রূপে। সে তোমাদেরকে সঠিক পথে চালাবে।"

উপরে বর্ণিত বহুমুখী গুণাবলীর ভিত্তিতে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব গড়ে উঠতে হবে। আসলে ইসলামী বিপ্লব সাধনে নেতৃত্বের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়। নেতৃত্বই জনগণকে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি ঐক্যবদ্ধ করে সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই তাঁর আকর্ষণীয় চরিত্রের মাধ্যমে জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মজবুত সংগঠন গড়ে তোলেন। নেতৃত্বের ইমেজের কারণেই জনগণ বিপ্লবের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এরই ফলে বিপ্লব সাধিত হয়। দুনিয়ার সাধারণ যে কোন বিপ্লব গণঅভ্যুত্থানেও নেতৃত্বের ভূমিকাই প্রধান হয়ে দেখা দেয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আম্বিয়ায়ে কিরাম, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী থেকে যেসব গুণাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় তা হলো ঃ

১. তাঁরা ছিলেন দ্বীনের আহ্বায়ক।
২. তাঁরা ছিলেন যথার্থ নেতৃত্ব দানকারী।

www.bjilibrary.com

৩. তাঁরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন, বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।
৪. তাঁরা স্বয়ংক্রিয় ও সক্রিয়ভাবে আমৃত্যু কাজে তৎপর ছিলেন।
৫. তাঁরা কাজ করেছেন নিঃস্বার্থভাবে, নিজের আরাম-আয়েশের প্রতি ছিলেন ভ্রূক্ষেপহীন।
৬. তাঁরা দাওয়াত দিয়ে গেছেন বিরামহীনভাবে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে।
৭ তাঁরা ছিলেন শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান।
৮. তাঁরা ছিলেন জ্ঞানে অগ্রগামী, দ্বীনের বুঝ-সমঝ সম্পন্ন।
৯. তাঁরা ছিলেন আমানতদার।
১০. তাঁরা ছিলেন লোকদের বুঝাবার যোগ্যতাসম্পন্ন, উত্তম বাগ্মী।
১১. তাঁরা ছিলেন দ্বীনের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী।
১২. তাঁরা ছিলেন সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারে দরদী।
১৩. তাঁরা ছিলেন খোশ মেজাজী।
১৪. তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার প্রতি বিমুখ।
১৫. তাঁরা ছিলেন আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট।
১৬. তাঁরা ছিলেন আল্লাহর বিরুদ্ধে বর্ণনাকারীদের বিরুদ্ধে নির্ভয়, দুরন্ত সাহসী।
১৭. তাঁরা ছিলেন পথপ্রাপ্ত, হেদায়াত দানকারী ও সিরাতুল মুসতাকিমের পরিচালক।
১৮. তাঁরা ছিলেন নিজ দায়িত্ব পালনে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকারী।

আধুনিককালে কোন দেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানে উপরোক্ত গুণাবলী থেকে শিক্ষা নিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দেশব্যাপী একটি নেতৃত্বের কাঠামো। কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত নেতৃত্বের এক চেইন সৃষ্টি করতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ডাকে যেন প্রতিটি জনপদে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, সে ধরনের নেতৃত্ব কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এটি হলো মজবুত সংগঠনের প্রধান শর্ত।

৩. কর্মীবাহিনীর বৈশিষ্ট্য ঃ

ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত সংগঠনে উদ্দেশ্যের ঐক্য হবে নেতা ও তার অনুসারী সকলের। সে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যেমন নেতার থাকতে হবে বলিষ্ঠ ভূমিকা, তেমনি নেতার অনুসারী কর্মীবাহিনী হবে নেতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল ও একাগ্রতাসম্পন্ন। সে ধরনের আনুগত্যশীল ও একাগ্রতাসম্পন্ন একটি কর্মীবাহিনীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো রাসূলুল্লাহর (সাঃ) আন্দোলনের সাহাবায়ে কিরাম। কুরআন পাকে সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলীর যেসব উল্লেখ রয়েছে তা থেকে পরবর্তীকালের আন্দোলনের কর্মীদের গুণাবলী কুরআন ও ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করা হলো।

www.bjilibrary.com

প্রকৃতপক্ষে কুরআনের বিভিন্ন সূরায় মুমিনদের যে সব গুণাবলী আলোচিত হয়েছে সে সব গুণাবলী সমন্বিতই ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সে সব বৈশিষ্ট্যেরই অধিকারী হওয়া দরকার। আলোচনার স্বল্প পরিসরে সে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়, তাই সংক্ষেপে ইসলামী বিপ্লব সাধনে নিয়োজিত কর্মীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. কর্মীগণ হবেন ঈমানের বলে বলীয়ান ঃ

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মূল পুঁজি হলো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান। নাযাতের উপায় হিসেবে কুরআন ঈমানদারদেরকে যে পথ বাতলায় তা হলো ঃ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ "ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি।" কুরআন আরো বলে– وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ– (سورة البقرة : ٤) "আখিরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাসী।" বস্তুতঃ আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি যে ব্যক্তির পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় ঈমান নেই সে ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হতে পারে না। আল কোরআন ও ইসলামী আদর্শের প্রতি তার এতটুকু আস্থা থাকতে হবে যে– সর্বযুগের সকল সমস্যার সমাধান এতে রয়েছে, এ পথই প্রকৃতপক্ষে মানুষের মুক্তির পথ, কল্যাণের পথ। তাকে এ কথার উপরও ঈমান আনতে হবে যে কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলেই চলবে না, বরং আল্লাহ কর্তৃক রাসূলের মাধ্যমে দেয়া জীবন-বিধানকে সমাজের বুকে বাস্তবায়িত করার জন্য করতে হবে চূড়ান্ত চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম। কুরআন সে কথাই ঘোষণা করেছে এভাবে ঃ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

অর্থ ঃ "তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের জান দিয়ে ও মাল দিয়ে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম– যদি তোমরা জানতে।" (সূরা ছফ ঃ আয়াত ১১)

২. কর্মীগণ হবেন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান ঃ

বিপ্লবের জন্য কর্মীগণকে হতে হবে আদর্শের ধারক ও বাহক এবং হতে হবে আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ। আল কুরআন তাদের ব্যাপারে বলেছে– তারা হবে আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ। তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য হবে কেবলমাত্র আল্লাহকে পাওয়া।

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ– "(سورة الانعام : ١٦٢)

www.bjilibrary.com

অর্থ ঃ "আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ- কেবলমাত্র বিশ্বপালক আল্লাহরই জন্য।" (সূরা আনআম ঃ আয়াত ১৬২)

অর্থাৎ তার জীবনের সকল কর্মকান্ড, সকল কাজ-কর্ম হবে একমাত্র আল্লাহকে কেন্দ্র করে এবং দ্বীনের খাতিরে।

নফ্সের পায়রবী, পরিবার প্রীতি, স্বার্থ-চিন্তা, সুবিধাবাদী নীতির পথ ধরে কেউ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হতে পারে না। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর জীবনোদ্দেশ্য কোনক্রমেই দুনিয়া হাসিল হতে পারে না বরং আখিরাতের সাফল্যই হবে তার চূড়ান্ত কাম্য।

গোটা যিন্দেগী আল্লাহর গোলামীতে নিয়োজিত করে, দ্বীনের বাস্তবায়নের জন্য সারা জীবন বিরামহীন চেষ্টা-সাধনা-জিহাদ চালিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন সাফল্য লাভই হবে ইসলামী বিপ্লব সাধনে নিয়োজিত সংগঠনে শামিল একজন কর্মীর জীবনোদ্দেশ্য।

৩. কর্মীগণ হবেন আনুগত্যশীল ও শৃংখলা পালনকারী ঃ

একজন কর্মীর আনুগত্যই প্রমাণ করে তিনি সত্যিকার কর্মী কি-না। নেতার আনুগত্য যিনি করেন তিনিই কর্মী। সংগঠনের দুই প্রধান উপাদান নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী। নেতা সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদেশ দেন আর কর্মীগণ তা পালন করেন। এজন্যেই হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন ঃ

لَاامَارَةَ الاَّ بِالطَّاعَةِ "আনুগত্য ছাড়া এমারত হয় না।" সাহাবায়ে কিরাম এর্জন্যই নির্দ্বিধায় বলেছেন ঃ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَ "আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।"

আম্বিয়ায়ে কিরাম তাদের অনুসারীদের নিকট থেকে আনুগত্যই দাবী করেছিলেন। আর কুরআন নবীর মাধ্যমে ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ –

অর্থ ঃ" অতএব ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গী-সাথী সাহাবায়ে কিরাম আনুগত্যের উত্তম মানদন্ড রেখে গেছেন। তাঁরা রাসূলের (সাঃ) সাথে দীর্ঘ নির্যাতন সহ্য করেছেন, হিজরত করেছেন, জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রাসূল (সাঃ)-এর যে কোন ইশারা-ই তাদের যথার্থ ভূমিকা রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁরা হযরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গী-সাথীদের মত ছিলেন না, যারা নবীর সাথে জিহাদের ডাকে বলেছিল ঃ "তুমি ও তোমার খোদা লড়াই করোগে, আমরা এখানে বসে রইলাম।"

বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন ছিলেন আদর্শ নেতা তাঁর সঙ্গী-সাথী সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তেমনি আদর্শ অনুসারী, আদর্শ কর্মী। এ জন্যেই

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংগঠন ছিল সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন যার কোন তুলনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর ইসলামী বিপ্লবের জন্য এমন একটি সংগঠনই অপরিহার্য যার আদর্শ নেতৃত্বের সাথে সাথে অনুসারী দল তথা কর্মীবাহিনীও হবে আদর্শ মানের আনুগত্যশীল।

যথার্থ আনুগত্য থাকলেই সৃষ্টি হবে আদর্শ মানের শৃংখল। বিপ্লবের জন্য শৃঙ্খলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিপ্লবের কর্মীগণ যেন একটি সেনাবাহিনীর সদস্য। সেনাবাহিনীর সদস্যগণ যেমন কমান্ডারের নির্দেশ মেনে চলেন প্রতি পদে পদে, তেমনি সুশৃংখল হতে হবে বিপ্লবের কর্মীবাহিনীকে। কোনস্থানে সমবেত হবার ডাক আসলে কর্মীগণ যথারীতি সেখানে হাযির হয়ে যাবেন, কোন কাজ থাকুক বা নাই থাকুক। কেবলমাত্র যথাসময়ে যথাস্থানে হাযির হওয়াটাই একটা কাজ বলে গণ্য করতে হবে।

ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য এমনি একটি আনুগত্যশীল ও সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কারণ এমন একটি কর্মীবাহিনী ছাড়া কোন মযবুত সংগঠন গড়ে উঠতে পারে না।

৪. কর্মীগণ হবেন আদর্শের জ্ঞানে জ্ঞানবান ঃ

আদর্শের জ্ঞান ছাড়া আদর্শ বাস্তবায়নের কর্মী হওয়া যায় না। ইসলামী বিপ্লব মানে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন। তাই ইসলামী বিপ্লব সাধনে নিয়োজিত কর্মীগণকে ইসলামী আদর্শের জ্ঞান অর্জন করতে হবে তার সাধ্যমত। কর্মীগণকে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে। যারা লেখাপড়া কম জানেন বা নিরক্ষর তাদেরকেও ইসলামী আদর্শকে বুঝতে হবে অন্যের কাছ থেকে, সভা-সমিতি, বক্তৃতা, ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে। ইসলামী বিপ্লবের জন্য শিক্ষিত হওয়া শর্ত নয়, কিন্তু আদর্শের জ্ঞান ও বুঝ সম্পন্ন হওয়া শর্ত। কেননা ইসলামী আদর্শকে যে ব্যক্তি সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন না তার পক্ষে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের কর্মী হওয়া সম্ভব নয়। তাকে এতটুকু জ্ঞান ও বুঝ সম্পন্ন হতে হবে যে, ইসলামী আদর্শই পূর্ণাঙ্গ। কোন ব্যক্তি কোন বিষয় বুঝতে হয়ত অসমর্থ কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে আদর্শের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইসলামী আদর্শের জ্ঞান কর্মীর জন্য গাড়ীর পেট্রোলের ন্যায়। পেট্রোলের অভাবে যেমন গাড়ী অচল, আদর্শের জ্ঞানের অভাবে তেমনি কর্মী অচল। কর্মীর মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা বা কাজের প্রেরণার অভাব দেখা দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর প্রধান কারণ হিসেবে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ত্রুটি ধরা পড়ে। গভীরভাবে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করলে ঈমানের মজবুতি আসে, কাজ-কর্মে প্রেরণা আসে, দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা আসে, আর আসে আমলে ও চরিত্রে পরিশুদ্ধতা। এসব গুণাবলী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর মূল্যবান পাথেয়।

www.bjilibrary.com

৫. কর্মীগণ হবেন উত্তম আমলের অধিকারী ঃ

মানুষের আমলই তার চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। আখিরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে আমলেরই উপর। কুরআন ঘোষণা করে যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন উত্তম আমলের পরীক্ষারই জন্য।

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً-

অর্থ ঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে-তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে, সে ব্যাপারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।"

আমল মানে কাজ। মানুষের গোটা জীবনের কাজ কর্ম আমলের অন্তর্ভুক্ত। আখিরাতের হিসাবের ব্যাপারে ধর্মীয় কাজ ও দুনিয়াবী কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দ্বীনি ও দুনিয়াবী সকল কাজের হিসাবেরই আখিরাতে শেষ বিচারের দিন ফয়সালা হবে। এ জন্যই কোরআন বলছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً- (سورة الكهف : ١٠٧)

অর্থ ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের জন্যই আল্লাহর মেহমানদারী স্বরূপ জান্নাতুল ফেরদাউস।" (সূরা কাহফ ঃ আয়াত ১০৭)

তাদেরই জন্য চূড়ান্ত সাফল্য। অর্থাৎ ঈমানের ভিত্তিতে আমলে সালেহ (সৎ কাজ) হতে হবে। আমল হল ঈমানের প্রকাশ বা বাস্তবায়ন। আমল যদি খারাপ হয় তবে ঈমান ভাল তার কোন প্রমাণ মিলে না। জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি যথার্থ ঈমান, এখলাছ (নিষ্ঠা) ও এতায়াত (আনুগত্য) সৃষ্টি হয়, তবে আমল ভাল হওয়া স্বাভাবিক।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সকল প্রকারের আমল এবাদত। আন্দোলনের কাজ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাজকর্ম, লেনদেন, ব্যবহার ও আচরণ সবকিছু হতে হবে পরিচ্ছন্ন ও উত্তম। আশ-পাশের মানুষ কর্মীর ঈমান দেখে না, দেখে তার আমল। আল্লাহ তায়ালা অবশ্য মানুষের ঈমান ও আমল দু'টোই দেখেন। কিন্তু হিসেব নিকেশ হবে আমলেরই। যথার্থ ঈমান ভিত্তিক সৎ আমলেরই সাফল্য।

৬. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ হবেন স্থায়ী কর্মী ঃ

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী কোন মৌসুমী কর্মী নয় বরং সে কাজ করে বিরামহীনভাবে, আজীবন। বস্তুতঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ আজীবন কর্মী। বিপ্লবের কর্মী সদা তৎপর ও কর্মচঞ্চল। তার নেই বিশ্রাম নেবার কোন ফুরসত, গল্প-গুজবে সময় কাটানোর কোন অবসর। পরিবার পালন, পেশা পরিচালনা বাদে বাকী সময়টুকু পরিকল্পিতভাবে আন্দোলনের কাজে ব্যবহার করাই কর্মীর কাজ।

www.bjilibrary.com

জীবনের মিশন হিসেবে আন্দোলনকে গ্রহণ করে তার জীবন গড়ে ওঠে। জীবনের মিশন হিসেবে যা গ্রহণ করা হয় তা সাময়িকভাবে বা মৌসুমী কাজের দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে না। তাই ইসলামী বিপ্লবের কর্মীগণ হবেন বিপ্লবের স্থায়ী কর্মী।

৭. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ হবেন দা'য়ী ইলাল্লাহ ঃ

নেতার অনুসরণ করে ইসলামী বিপ্লবের কর্মীগণও আল্লাহর পথে, দ্বীনের প্রতি দুনিয়ার মানুষকে ডাক দিয়ে যাবেন। কর্মীর পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মী, এলাকাবাসী তথা দেশের জনগণকে ইসলামী বিপ্লবে নিবেদিত প্রাণ কর্মী বিপ্লবের পতাকাতলে শামিল হবার আহ্বান জানাতে থাকবেন অবিরাম। সময়-সুযোগমত এ ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করবেন, তাদেরকে বুঝাবেন, একা একা তাদেরকে বুঝাবেন, গ্রুপ ভিত্তিক তাদেরকে দাওয়াত দিবেন, সভা-সমিতির মাধ্যমে তাদের প্রতি আহ্বান জানাবেন, বই-পত্র ও পত্র-পত্রিকা পড়িয়ে দাওয়াতের কাজ করবেন– এভাবে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে জনগণকে দ্বীনের পথে আনার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাবেন। এ কাজকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত উন্নত মানের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন কুরআন পাকের মাধ্যমে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ–

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে (লোকদেরকে) ডাকল তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কি হতে পারে?" (হা-মিম-আস সাজদা ঃ আয়াত ৩৩)

এক একজন কর্মী তার পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে এভাবে দ্বীনের পথে এগিয়ে আনতে পারলেই দ্বীনের ঘাঁটি মজবুত হবে। এভাবে জনগণের সমর্থন লাভ ও দ্বীনের প্রতি প্রবল জনমত তৈরী হলেই ইসলামী বিপ্লব সাফল্য লাভ করবে।

৮. কর্মীদেরকে বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হবে আপোষহীনভাবে ঃ

কর্মীগণ দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে একামতে দ্বীনের কাজে নামলে চিরাচরিত পন্থায় বিরোধী বাতেল শক্তির পক্ষ থেকে আসবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, গালাগাল, হামলা ও আঘাত। অথবা লোভ-লালসা, সুবিধাবাদের হাতছানি আসবে দ্বীনের পথ থেকে সরে পড়ার বিনিময়ে। এমতাবস্থায় ইসলামী বিপ্লবের কর্মী লোভ-লালসা ও হাতছানিকে পায়ে ঠেলে আপোষহীনভাবে মোকাবেলা করে যায় বিরোধী শক্তির হামলা ও আঘাতকে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুমান করে তারা আন্দোলন থেকে সরে পড়ে না বা দ্বিধান্বিত হয়ে থমকে দাঁড়ায় না বরং অটল, অবিচলভাবে বিরোধী শক্তির প্রতি কঠোর নীতি গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে তাদের অবস্থা কুরআন বর্ণনা করে এভাবে ঃ

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ

অর্থ ঃ "তারা কাফিরদের প্রতি বজ্র কঠিন"। অবশ্য দাওয়াত দানের পর্যায়ে

www.bjilibrary.com

বিরোধিতা এলে শান্তভাবে যুক্তির মাধ্যমে তিনি জবাব দিয়ে বিষয়টি বুঝাবার চেষ্টা করেন, রাগান্বিত হয়ে ঝগড়ার সূচনা করেন না। এভাবে ঝগড়ার সূচনা করলে তার মূল মিশনটাই ভন্ডুল হয়ে যায়। কিন্তু দ্বীনের আন্দোলনের ফলে জুলুম-নির্যাতন আসলে কর্মী আপোষের পথ ধরেন না, বিরোধী শক্তির প্রতি কঠোর মনোভাবই গ্রহণ করেন।

৯. জুলুম-নির্যাতনের মোকাবেলায় সবর-ধৈর্যধারণ কর্মীর এক মহান বৈশিষ্ট্য ঃ

ইসলামী আন্দোলনের কারণে কর্মীর জীবনে যে জুলুম-নির্যাতন, হয়রানী ও বিপদের ঘনঘটা নেমে আসে সে ক্ষেত্রে সবর এখতিয়ার করা-ধৈর্যধারণ করে অবিচলভাবে দ্বীনের পথে টিকে থাকা কর্মীর এক মহান গুণ। এ গুণের কারণে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন বলে জানিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণা ঃ

اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا - اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ-

অর্থ ঃ "আজ তাদের সেই ধৈর্যশীলতার এ ফল দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম"
(সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ১১১)

বস্তুতঃ সবর ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের পথে মোটেও টিকে থাকা যায় না। কর্মীর জীবনে সবরের অভাব থাকলে হতাশা ও নিরাশা তাঁকে পেয়ে বসবে– টিকে থাকতে পারবেন না তিনি এ আন্দোলনে।

এ সবরের জন্য দরকার আল্লাহর প্রতি গভীর ঈমান, আখিরাতে ফলাফল লাভের দৃঢ় প্রত্যাশা। এ সবরের ফলে হয়ত তাকে দিতে হবে অনেক ত্যাগ ও কোরবানী-কিন্তু তাতে তিনি ঘাবড়ে যাবেন না বা মুষড়ে পড়বেন না, বরং একান্তভাবে দ্বীনের পথে কাজ করে তিনি তিলে তিলে নিজেকে বিলিয়ে দিবেন দ্বীনের পথে।

১০. কর্মীগণ কেবলমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল-ভরসা ও নির্ভর করবেনঃ

কর্মী তার সকল কাজ-কর্মে, বিরোধী শক্তির মোকাবেলায়, কঠিন বিপদ মুসিবতে কেবলমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভর করবেন। আল্লাহর উপর ভরসা করেই নির্দ্বিধায় এগিয়ে চলবেন সামনের দিকে। আর আল কুরআনের শিক্ষার আলোকে ঘোষণা দিবেন ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ-

অর্থ ঃ "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম অভিভাবক, উত্তম বন্ধু ও উত্তম সাহায্যকারী।"

আল্লাহর উপর এ ধরনের গভীর আস্থাই কর্মীকে দ্বীনের পথে গভীরভাবে অবিচল-অটল হয়ে কাজ করার তৌফিক দান করে। তাই আল কুরআন মুমিনের অন্যমত গুণ হিসেবে তাওয়াক্কুলের কথা বিভিন্নস্থানে বর্ণনা করেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

মুমিনগণ কেবলমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।

ইসলামী বিপ্লবের সকল কাজের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম ক্ষমতা নিয়ে তৈরী আছেন-এ আস্থা কর্মীকে করে তোলে বলীয়ান, নির্ভীক। সে অকুতোভয়ে আন্দোলনের সকল কাজ করে যায় বিরামহীন ভাবে।

১১. ইসলামী বিপ্লবের কর্মীগণ হবেন আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ, বিনয়ী, তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থনাকারী ঃ

বিপ্লবের কর্মী তার যাবতীয় কাজ কেবলমাত্র আল্লাহরই নিকট পেশ করবেন বিনীতভাবে। দ্বীনের পথে যে কোন ত্যাগ ও কোরবানী, সকল প্রকার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা কর্মীর মনে কোনরূপ অহংকার এবং যথেষ্ট করে ফেলেছি এমনভাব সৃষ্টি করবে না বরং সকল কাজের মধ্যে যে সব ভুল-ত্রুটি হয়ে গিয়েছে তার জন্য কর্মী বারে বারে আল্লাহর নিকট তওবা করবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় মানুষের সাধ্যের অতীত। তাছাড়া মানুষ হিসেবে কর্মী কোন অবস্থায়ই ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। এ জন্যেই ইসলামী বিপ্লবের কর্মীকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, দিনভর বিপ্লবের কাজ করবে, ছুটে বেড়াবে দায়িত্ব পালনে আর রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে যাবে আল্লাহর দরবারে, কাতর কণ্ঠে আল্লাহর নিকট জানাবে তার ফরিয়াদ, ক্ষমা প্রার্থনা করবে তার গুনাহ-খাতার, তওবা করবে তার অতীতের ভুলত্রুটির ও গুনাহের জন্যে। তাই কর্মীর অবস্থা হলো কুরআনের ভাষায় ঃ

يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا-

অর্থ ঃ "তারা রাত জাগরণ করে তাদের রবের দরবারে সেজদা ও দাঁড়ানো অবস্থায়, আর তারা হন –التَّائِبُوْنَ। বারে বারে তওবাকারী।"

১২. কর্মীগণ থাকেন আত্মগঠনে নিয়োজিত ঃ

ইসলামী বিপ্লবের কর্মীগণ উপরে বর্ণিত গুণাবলী সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহরূপে গঠন করতে সদা-সর্বদা প্রচেষ্টারত থাকেন। ঈমানের মজবুতি অর্জন, আমলের পরিশুদ্ধতা লাভ, জ্ঞানার্জনে মনোযোগ দান, নেতার আনুগত্য ও শৃংখলা বিধানে একনিষ্ঠতা, সবর, তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে কর্মীর আত্মগঠনের কাজ এগিয়ে চলে। এভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের শর্তাবলী পূরণে যে হয় তৎপর এবং কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্যে ও আল্লাহর দ্বীনের জন্যে সে নিজের জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দেয়। সে যেমন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নির্ধারিত এবাদত-বন্দেগী করে, তেমনি নিষ্ঠার সাথে আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করে।

www.bjilibrary.com

১৩. কর্মীগণ অন্যদেরকে গঠনেও ভূমিকা রাখেন ঃ

কর্মীগণ কেবলমাত্র নিজেকে গঠনেই আত্মনিয়োগ করেন না বরং তার পরিবার, নিকটাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মীসহ পারিপার্শ্বিক লোকদের মধ্য থেকে বাছাই করে নতুন নতুন কর্মী গঠনেও যথার্থ ভূমিকা রাখেন। ইসলামী বিপ্লবের কর্মী পরিবারের সদস্যদের চরিত্র গঠন, ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধকরণ ও ইসলামী বিপ্লবের একটি ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি ও অন্যান্য লোকদেরকে ইসলামী বিপ্লবের পথে শুধুমাত্র আহ্বানই জানান না, তাদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত লোকদের চিন্তার বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে মন-মানসিকতার পরিবর্তন সাধনের জন্য গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি, আলোচনা, বই-পত্র ও পত্র-পত্রিকা পড়ানো, এবাদত ও আন্দোলনের কাজ-কর্মে অংশ গ্রহণ করানো– এ সব কাজের মাধ্যমে তাকে কর্মীরূপে গড়ে তোলেন। এভাবে নতুন নতুন কর্মী ইসলামী আন্দোলনে নতুন রক্ত সঞ্চালন করে, আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।

উপরোক্ত গুণাবলীসহ ইসলামী বিপ্লবের কর্মীগণ হন উত্তম গুণাবলীসম্পন্ন একটি কর্মীবাহিনী। তারা দলীয় গঠনতন্ত্র, নীতি-পদ্ধতি, কর্মসূচী ও কর্মপন্থা অনুয়ায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করে। ফলে তা একটি উত্তম সংগঠনের রূপ লাভ করে।

৪. কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি ঃ

একক উদ্দশ্য সাধনের লক্ষ্যে নেতৃত্বের অধীনে কর্মীবাহিনীর যে ভূমিকা তা যথাযথভাবে আঞ্জাম দানের জন্য দরকার কিছু নিয়ম-নীতি, কর্মপদ্ধতি, গঠন ও সংগঠন পদ্ধতি নেতা ও কর্মী সম্পর্কিত কিছু দলীয় পদ্ধতি, কর্মসূচী ইত্যাদি। এ পর্যায়ে ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত সংগঠনের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোচ্য ঃ

১. গঠন প্রকৃতি ঃ গঠনতন্ত্র
২. কর্মনীতি
৩. নেতা ও কর্মী সংক্রান্ত দলীয় নীতি পদ্ধতি
৪. কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন পদ্ধতি
৫. কর্মসূচী-পরিকল্পনা

গঠন প্রকৃতি ঃ গঠনতন্ত্র

ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত সংগঠনের গঠন প্রকৃতি নির্ধারিত হয় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে। গঠন প্রকৃতি সম্পর্কিত লিখিত এ দলীলকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় গঠনতন্ত্র বা সংবিধান। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ বা মজলিশে শুরা এ গঠনতন্ত্র তৈরী ও সংযোজন-সংশোধন করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর নীতি-পলিসিকে সামনে রেখেই এ গঠনতন্ত্র তৈরী হয়। এ গঠনতন্ত্রে সংগঠনের উপাদানগুলোর প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বর্ণনা করা হয়।

গঠনতন্ত্রে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মনীতি, সদস্যপদ, নেতৃত্ব-কাঠামো নির্ধারণ, বায়তুলমাল ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারা বর্ণনা থাকে। সাংগঠনিক কাঠামো ও

www.bjilibrary.com

স্তর বিন্যাস করা হয়,সদস্যপদ বাতিল, বহিষ্কার, নেতৃত্বের অপসারণ, নির্বাচন পদ্ধতি, গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকে।

সংগঠনের জন্য গঠনতন্ত্র এক পবিত্র দলিল। সংগঠনের অধীন সকলে এ গঠনতন্ত্র মেনে বলতে বাধ্য। গঠনতন্ত্র বিরোধী কোন কার্যকলাপ অবশ্যি শৃংখলার খেলাফ। গঠনতন্ত্রকে মেনে চলার সুস্পষ্ট ওয়াদার ভিত্তিতেই কোন ব্যক্তি সদস্যপদ লাভ করে বা নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। তাই শৃংখলার পরিপন্থী ও গঠনতন্ত্র বিরোধী কোন কার্যকলাপ কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলামী সংগঠনের গঠনতন্ত্রের মৌল বিষয়সমূহ ঃ

উক্ত সংগঠনের শুরুতেই আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার। সংগঠনের জনশক্তির উদ্দেশ্যে ঐক্য সাধনে এ ধারাগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ আকীদা বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে কালেমা-তাইয়েবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই করা হয়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্যের ভিত্তি হলো ঈমান ও আকীদার ঐক্য। সকল প্রকার শিরকমুক্ত, চূড়ান্ত ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, নিরংকুশ মালিকানার স্বত্ত্বাধিকারী, মানুষের যাবতীয় কল্যাণ–অকল্যাণের মূল উৎস আল্লাহ তায়ালার প্রতি নির্ভেজাল ঈমান পোষণকারী একটি মানবগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই একই উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হয়। সে ঐক্য পূর্ণতা লাভ করে সকল কাজে-কর্মে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নেতৃত্ব ও মানদন্ডের স্বীকৃতির মাধ্যমে। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এভাবে যথার্থ ঈমান পোষণকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গড়ে ওঠে তা হলো, বিশ্ব মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য দ্বীন ইসলাম তথা ইসলামী জীবন-বিধানের বাস্তবায়নের (একামতে দ্বীন) মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এভাবে গঠনতন্ত্র সংগঠনভুক্ত জনশক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টাকে একক উদ্দেশ্যে পরিণত করে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে যারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পরিণত করে, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফরজ-ওয়াজেব ও হালাল-হারাম মেনে চলতে রাজী হয় এবং এই গঠনতন্ত্রের অনুসারী ও বাধ্য থাকার স্বীকৃতি প্রদান করে তারাই সংগঠনের সদস্য হিসেবে শপথ নেয়। সদস্যদের সরাসরি ভোটেই সংগঠনের নেতা নির্বাচিত হয়। দেশের প্রশাসনিক কাঠামোর ভিত্তিতে সাংগঠনিক স্তর-বিন্যাস করা হয় এবং প্রত্যেক স্তরের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সেই স্তরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ, নির্বাচন, সাংগঠনিক স্তর-বিন্যাস, নেতৃত্বের অপসারণ, সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার, গঠনতন্ত্রের সংশোধন ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারায় সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকে। সংগঠনের গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রে লিখিত সকল বিষয়কে ভিত্তি করেই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

www.bjilibrary.com

কর্মনীতি ঃ

ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত সংগঠনের কর্মনীতিও কুরআন সুন্নাহর আলোকে নির্ধারিত হয়। ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য অনৈসলামিক সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী সরকার গঠন। সরকার পরিবর্তনের কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে ঃ

১. সশস্ত্র বিপ্লব,

২. নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে নির্বাচন ও

৩. গণ-অভ্যুত্থান।

১. সশস্ত্র বিপ্লব ঃ

সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত হয় কতিপয় অস্ত্রসজ্জিত লোকের গোপন সংগঠনের মাধ্যমে। বন্দুকের নলের জোরে ক্ষমতাসীনদেরকে উচ্ছেদ করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ইসলামী বিপ্লবের ধারা কোন কালেই এ ধরনের ছিল না। নবী-রাসূলগণ প্রকাশ্যভাবেই ক্ষমতাসীন মহলকে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত দিয়েছেন। কোন নবী-ই গোপন সংগঠন কায়েম করে অস্ত্রের বলে ক্ষমতাসীনদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেননি। তাই গোপন সংগঠন করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন ও ইসলামী বিপ্লব সাধন কোনক্রমেই কুরআন-হাদীস ভিত্তিক হতে পারে না।

২. নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ঃ নির্বাচন ঃ

ইসলামী বিপ্লবের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই সবচেয়ে উত্তম পন্থা। এ ধরনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে জনগণকে ইসলামী জীবন-বিধানের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সাথে সাথে দেশের সরকারকেও ইসলামী জীবন-বিধানের বাস্তবায়ন ও অনৈসলামিক কার্যক্রম বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। নবী-রাসূলগণ তদানীন্তন প্রতিষ্ঠিত হুকুমত ও নেতৃত্বকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্বের এবং নবীর আনুগত্যের আহ্বান জানান। প্রতিষ্ঠিত হুকুমত ও নেতৃত্ব সে ডাকে সাড়া দেয়নি বরং চরমভাবে নবীর বিরোধিতা করেছে, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, নবীর মিশনকে নির্মূল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। সে অবস্থায় নবী-রাসূলগণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের জনগণকে এ দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং যারাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি সংঘবদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন। এভাবে জণগনকে সাথে নিয়েই বরং তাদের ত্যাগ-তীতিক্ষা ও কুরবানীর বিনিময়ে ইসলামী বিপ্লবকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন, কায়েম করেছেন নবীর নেতৃত্ব।

আজকেও জনগণকে সাথে নিয়েই ইসলামী বিপ্লবকে সাফল্যমন্ডিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এরই জন্য প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন।

www.bjilibrary.com

যে সব দেশে গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থা চালু আছে, সে সব দেশে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে জনগণকে বিপ্লবের সক্রিয় সহযোগী শক্তিতে পরিণত করতে পারলেই ইসলামী বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমেই বিপ্লবের পক্ষে গণরায় লাভ করা যাবে। জনগণের ভোটের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করবে।

৩. গণ-অভ্যুত্থান ঃ

যেসব দেশে গণতন্ত্র চালু নেই, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেই, সেসব দেশে দেশের সার্বিক জনশক্তিকেই ইসলামী বিপ্লবের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করতে হবে। ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে গণজাগরণের মাধ্যমে গণজোয়ার সৃষ্টি করতে পারলেই ইসলামী বিপ্লবের আশা করা যায়। অবশ্য প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি বা ইসলাম বিরোধী শক্তির চরম নির্যাতন, হয়রানী, জেল-জুলুম, সশস্ত্র আক্রমণ, শাহাদাত ইত্যাদি ইসলামী বিপ্লবের পথ আগলে দাঁড়াবে। এ সবকে মোকাবেলা করেই ইসলামী বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে একটি বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত করতে পারলেই গণ-অভ্যুত্থান সম্ভব।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী সরকার গঠন- গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবী সরকার গঠনের চেয়ে কম কঠিন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ জনগণকে সমর্থক শক্তিতে পরিণত করতে পারলেই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে জনগণকে সংগঠিত করা ছাড়া গণঅভ্যুত্থান সম্ভব নয়।

অবশ্য গণতন্ত্র যদি সত্যিকার গণতন্ত্র না হয়ে একনায়কত্ব বা সামরিকতন্ত্রের অধীনে গণতন্ত্রের মহড়া হয়, নির্বাচন যদি হয় পক্ষপাতদুষ্ট, ব্যালট ডাকাতি আর মিডিয়া ক্যু ইত্যাদি যদি নির্বাচন ব্যবস্থায় চালু হয়, সেক্ষেত্রে ইসলামী বিপ্লবের সমর্থক জনগোষ্ঠীকে এ পরিমান শক্তি অর্জন করতে হবে যাতে নির্বাচনে জোর জবরদস্তি, ব্যালট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যু'র মত অনাকাঙ্খিত কার্যক্রমকে প্রতিহত করা যায়। গণঅভুত্থান সম্ভব হলে নির্বাচনে অনাকাঙ্খিত কার্যক্রম বন্ধ করা কঠিন হবার কথা নয়।

তাই যে সব দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রয়েছে– সেসব দেশে জনগণকে ইসলামী বিপ্লবের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করে নির্বাচনের মাধ্যমেই ইসলামী বিপ্লব সাধনের উদ্যোগ নিতে হবে। আর যেসব দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু নেই;

www.bjilibrary.com

রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র; সামরিকতন্ত্র– জাতীয় স্বৈরশাসন চালু রয়েছে, সেসব দেশে জনগণকে সংগঠিত করে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সাধন ব্যতিত কোন বিকল্প নেই।

দলীয় নীতি পদ্ধতি ঃ

ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত সংগঠনের কিছু নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে হয়। নেতা ও কর্মীর সমন্বয়ে ব্যক্তিগত গুণাবলী ছাড়াও কতিপয় জরুরী দলীয় গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। এ সব গুণাবলীসহ যেসব দলীয় পদ্ধতি ইসলামী সংগঠনের বৈশিষ্ট্য সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. নেতার মর্যাদা এবং নেতা ও কর্মীর সম্পর্ক ঃ

ইসলামী সংগঠনের নেতার মর্যাদা 'উলিল আমর'এর মর্যাদা। অর্থাৎ কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ –

"তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা হুকুম দেবার অধিকারী তাদেরও।" (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

এ আয়াতের ভিত্তিতে নেতার আদেশ পালন কর্মীর জন্য ওয়াজিব। নেতা অবশ্য আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে কর্মীর অবস্থা বিবেচনা করবেন। কর্মী কেন ওজর পেশ করলে তা বিবেচনা করবেন। কর্মীর প্রতি নেতার যে দরদ ও সহমর্মিতা তা যথাযথভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এসব বিষয়ে বিবেচনা রেখে নেতা যে আদেশ দিবেন কর্মী তা নির্দ্বিধায় মেনে নিবেন এবং শরয়ী দৃষ্টিতে তা পালন করবেন। এমনিভাবে নেতার আদেশ দান ও কর্মীর আদেশ পালন দু'টোই দ্বীনি কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে।

২. শৃংখলা ও টীম স্পিরিট ঃ

সংগঠন মানে একদল লোকের একটি টীম। এ টীমের অধিনায়ক হলেন সংগঠনের নেতা আর সদস্যবৃন্দ হলেন টীমের কর্মীবৃন্দ। নেতা ও কর্মীবৃন্দ যদি স্ব-স্ব অবস্থানে শৃংখলা ও আনুগত্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন তা হলেই সংগঠন কার্যকর হয়। বিশৃঙ্খলভাবে ফেলে রাখা অনেকগুলো ইটের নাম অট্টালিকা নয়। এ ইটগুলোকে অট্টালিকার রূপ দিতে হলে প্রয়োজন দক্ষ কারিগরের মাধ্যমে সিমেন্ট-বালিসহ তাকে সুশৃংখলভাবে গড়ে তোলার, এর জন্য প্রয়োজন আনুগত্যের।

তাই সংগঠনের অপরিহার্য শর্ত হলো নেতা ও কর্মীদেরকে টীম স্পিরিট নিয়ে একটি টীমের মত কাজ করা। টীম স্পিরিটের জন্য যেমন প্রয়োজন শৃংখলার

www.bjilibrary.com

তেমনি প্রয়োজন একে অপরের সহযোগিতার। এর জন্য আরো প্রয়োজন সময়ানুবর্তিতার ও নিয়মানুবর্তিতার। ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন সংগঠনের সিদ্ধান্ত নিতে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে টীম স্পিরিট নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে যেতে হবে।

এ প্রসঙ্গে কুরআন পাকের সূরা ছফ-এর সে আয়াতটি উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকেই ভালবাসেন, যারা সারিবদ্ধভাবে তাঁরই পথে এমনভাবে লড়াই করে যেন তারা সীসা গলিত প্রাচীর।" (সূরা ছফ ঃ ৪)

এখানে সীসা গলিত প্রাচীরের ন্যায় মজবুত হয়ে সারিবদ্ধভাবে লড়াইরত মুমিনগণ আল্লাহর ভালবাসা লাভ করবেন বলে বলা হয়েছে। এ আয়াত থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করতে পারি তা হলো ঃ

ক. কেবলমাত্র আল্লাহর তসবিহ পাঠ ও এবাদত করলেই আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যায় না, এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী শক্তির সাথে আল্লাহর পক্ষ হয়ে লড়াই করা।

খ. আল্লাহর পথে লড়াই একা একা করা যায় না, মুমিনদেরকে দলবদ্ধ হয়েই লড়াই করতে হবে।

গ. দলবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয়ে অর্থাৎ শৃঙ্খলার সাথে লড়াই করতে হবে।

ঘ. শৃঙ্খলার সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজন নেতার আনুগত্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা।

ঙ. এই সারিবদ্ধতা বা শৃঙ্খলা হতে হবে অত্যন্ত মজবুত ও দৃঢ়, যার তুলনা করা হয়েছে সীসাগলিত প্রাচীরের সাথে যাতে কোন ফাঁক-ফোকর থাকতে পারে না।

তাই ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত সংগঠন হবে অত্যন্ত মজবুত শৃঙ্খলা সম্পন্ন, ফলে তা একটি চমৎকার টীম স্পিরিট নিয়ে কাজ করবে।

৩. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা ঃ

যে মজবুত শৃঙ্খলা ও টীম স্পিরিটের কথা পূর্বে আলোচনা হল, তার জন্য পূর্বশর্ত হলো, সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ থাকতে হবে। পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ ও সহযোগিতার সম্পর্ক থাকতে হবে। উদ্দেশ্যের ঐক্য যদি যথার্থ ও মজবুত হয় তাহলে এ ধরনের মজবুত সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া সম্ভব

www.bjilibrary.com

এবং স্বাভাবিক। বিক্ষিপ্ত ইটগুলোকে যেমন একজন কারিগর সিমেন্ট, বালি ও পানির মিশ্রণে পরস্পর একত্র করে মজবুত দেয়াল গড়ে তোলেন, সংগঠনের সদস্যদের মধ্যেও তেমনি উদ্দেশ্যের ঐক্যের ফলে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা এক মজবুত সংগঠন গড়ে তোলে। আল-কুরআন ঘোষণা দেয় ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ-

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক চিরন্তন। ইহকালে সংগঠনের মাধ্যমে যেমন এ সম্পর্ক বজায় থাকে, আখিরাতেও তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে চিরসুখী বেহেশ্‌ত লাভের কারণে তা থাকে অটুট। তাই মজবুত সংগঠনের জন্য সংগঠনের অধীনস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের এবং গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক অবশ্যি থাকতে হবে।

এ সম্পর্কে আধুনিককালে ইসলামী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী" বইতে সুন্দরভাবে উল্লেখ করে বলেন ঃ

"কোন দলের সদস্যদের দিল পরস্পরের সাথে একসূত্রে গ্রথিত থাকলে তবেই তা ইস্পাত প্রাচীরে পরিণত হয়। আর এ দিলগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে আন্তরিক ভালোবাসা, পারস্পরিক কল্যাণাকাঙ্খা সহানুভূতি ও পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার। ঘৃণাকারী দিল কখনো পরস্পর মিলে-মিশে থাকতে পারে না। মোনাফেকী ধরনের মেলামেশা কখনো সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে না। স্বার্থবাদী ঐক্য ঐক্যের পথ প্রশস্ত করে না। আর নিছক শুষ্ক-নিরস ব্যবসায়িক সম্পর্ক কোন সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিণত হতে পারে না। কোন পার্থিব স্বার্থ এ ধরনের সম্পর্কহীন লোকদেরকে একত্রিত করলেও তারা নিছক বিক্ষিপ্ত হবার জন্যেই একত্রিত হয় এবং কোন মহৎ কাজ সম্পাদন করার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেই শেষ হয়ে যায়। যখন একদল নিঃস্বার্থ চিন্তার অধিকারী ও জীবনোদ্দেশ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী লোক একত্রিত হয়, অতঃপর চিন্তার ঐ নিঃস্বার্থতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি অনুরাগ তাদের নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে, কেবলমাত্র তখনই একটি মজবুত ও শক্তিশালী দলের সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের দল আসলে ইস্পাত প্রাচীরের ন্যায় অটুট হয়। শয়তান এর মধ্যে ফাটল ধরাবার কোনো পথই পায় না। আর বাহির থেকে বিরোধিতার তুফান এনে এর বিরুদ্ধে দাঁড় করালেও একে স্থানচ্যুত করতে পারে না।"

www.bjilibrary.com

৪. পারস্পরিক পরামর্শ ঃ

কোন দলের মজবুতি নির্ভর করে দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির উপর। দলের লোকেরা যদি একেক জন নিজস্বভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তা কোন দলই হয় না। আবার এক ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দলের উপর তা চাপিয়ে দেয় তবে সে ধরনের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় না। বরং দলের সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয় নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে, তাহলে সিদ্ধান্ত যেমন হয় বলিষ্ঠ, তেমনি তা কার্যকরও হয় যথাযথভাবে। ইসলামী বিপ্লবের জন্য এমনি বলিষ্ঠ ও কার্যকর সিদ্ধান্তেরই প্রয়োজন। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে ঘোষণা করেন ঃ

أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ-

"তাদের কার্যাবলী হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।"

বস্তুতঃ সংগঠনের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য পরামর্শ অপরিহার্য। সংগঠনের পরিকল্পনাও পরামর্শের ভিত্তিতেই প্রণয়ন করা দরকার। আর সে পরামর্শের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট নিয়মনীতি। সংগঠনের গঠনতন্ত্রে পরামর্শের নিয়মপদ্ধতি লিখা থাকা প্রয়োজন এবং সে নিয়মানুযায়ী গঠিত হওয়া দরকার একটি পরামর্শ সংস্থা। প্রতিটি সাংগঠনিক স্তরেই এ ধরনের সংস্থার সকল সদস্যই অকপটে তার বক্তব্য পেশ করবে এবং আলাপ-আলোচনার পর সংখ্যাধিক্যের মতে যে ফয়সালা হবে তাকে সবাই সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করবে। এভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে দলের মধ্যে অনৈক্য ও দলাদলির পথ বন্ধ হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকলের ঐকান্তিকতা প্রকাশ পায়। কোন সমস্যাকে সকলে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ লাভ করে। সিদ্ধান্তকে সকলেই নিজের সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করে। এতে পারস্পরিক সম্পর্কও উন্নত হয়, টীম স্পিরিটও বৃদ্ধি পায় এবং সকলে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করে।

৫. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা ঃ

সংগঠন মানে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত একটি সংস্থা। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যই তার যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা। তার সকল কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো টার্গেটে পৌঁছা। এই টার্গেটে পৌঁছার জন্য সংগঠনের বিরামহীন ও অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হয়। ইসলামী বিপ্লব সাধনের কাজ কোন মৌসুমী কাজ নয়। এ এক অবিরাম অব্যাহত কাজ। বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা, পুনরায় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন– এমনি ধারাবাহিকভাবে ও পর্যায়ক্রমে চলে ইসলামী বিপ্লবের কাজের ধারা। সংগঠনের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সদা তৎপর থাকে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম।

www.bjilibrary.com

৬. সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা ঃ

বহুলোকে এক সংগঠনে কাজ করলে কিছু লোকের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া, মতভেদ হওয়া, একের কাজে অন্যের মনক্ষুণ্ন হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু এতসদত্ত্বেও সংগঠনের আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে রাখতে হবে সুন্দর, পরিমার্জিত, গ্রুপিং ও ষড়যন্ত্রমুক্ত, পারস্পরিক কাঁদা ছোড়াছুড়িমুক্ত, একে অপরের প্রতি সহনশীল ও উদার। এ অবস্থা তখনই সম্ভব হতে পারে– যদি সংগঠনের ভিতর সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনার ব্যবস্থা চালু থাকে।

ইসলামী বিপ্লব সাধনের এ আন্দোলন আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরসূরী আন্দোলন। আম্বিয়ায়ে কিরাম মহান আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হতেন। তাই তাদের জন্য সহকর্মীদের সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই সূত্রের রেশ ধরে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে করা, তার ভুল ধরা পাপ–এমন ভাবা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, নেতা বা কোন সহকর্মীর কোন কাজ তার কাছে প্রশ্নবোধক মনে হলে তা নির্দ্বিধায় এবং অকপটে একটি অনুকূল পরিবেশে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে বলতে হবে। প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যেতে পারে। তা না হলে পরবর্তী পর্যায়ে বৈঠকাদিতেও উঠানো যেতে পারে। কিন্তু সর্বদা সমালোচনার ভাষা হবে মার্জিত এবং সংশোধনের উদ্দেশ্যেই যে তা করা হচ্ছে তা যেন সুস্পষ্ট হয়। দায়িত্বশীলদের কার্যক্রমেরও সমালোচনা হতে পারে কিন্তু সর্বদাই তা হবে পরিবেশকে আরো উন্নত করা, পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো প্রীতিপূর্ণ করা, অনৈক্য ও মনোমালিন্য দূর করা এবং সর্বোপরি একটি সুস্থ সাংগঠনিক অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে। সমালোচনা ব্যবস্থা যদি এর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে, তবে সে ধরনের সমালোচনা কাম্য নয়। নীতিবিরুদ্ধ, গর্হিত পথে নেক নিয়তের সমালোচনাও বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। তাই তা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। বরং সেই সংগঠনই মজবুত ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে– যাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমের ভিতরই সমালোচনার পথ খোলা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে পদ্ধতি মোতাবেক সমালোচনা ব্যবস্থা জরুরী রাখলে সংগঠনে আসতে পারে না মতবিরোধ, দলাদলি, গ্রুপিং, ষড়যন্ত্র, কোন্দল ও ভাঙন। এমতাবস্থায় একটি মজবুত সংগঠন গড়ে উঠবে- যা মঞ্জিলে মকসুদের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

কর্ম পদ্ধতি ঃ

ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য সংগঠনে একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতি গৃহীত হয়। কর্মপদ্ধতির কয়েকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক. দাওয়াত

খ. আন্দোলনের ডাকে সাড়া প্রদান ও সংগঠন

www.bjilibrary.com

গ. আহ্বানের বিরোধিতা ও লোক তৈরী
ঘ. সংগঠনের প্রসার ও মজবুতি এবং চরম বিরোধিতা ও বিরোধিতার মোকাবেলা
ঙ. আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

ক. দাওয়াত ঃ

ইসলামী বিপ্লবের প্রধান বাহন হলো দাওয়াত– আন্দোলনের প্রতি আহ্বান। প্রথমেই একজন দা'য়ীর মনে ইসলামী বিপ্লব সাধনের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি হৃদয়-মন দিয়ে ইসলামী বিপ্লব সাধনের মহান কাজে আত্মনিয়োগ করার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সমসাময়িক জনসমষ্টির নিকট দ্বীনের প্রতি, আল্লাহর প্রতি উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দেন। এ দাওয়াত নবী-রাসূলদের এক চিরন্তন নীতি। এ প্রসঙ্গে কুরআন পাক ঘোষণা দেয় ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ–

"আল্লাহর প্রতি যে ডাক দিল তার চেয়ে উত্তম কথা আর কি হতে পারে।"

যুগে যুগে, এলাকায় এলাকায় আল্লাহর প্রতি আহ্বানের মাধ্যমেই সূচনা হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের। আজও সেই ডাকই ইসলামী বিপ্লবের সূচনাপর্ব ও অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী।

খ. সাড়া প্রদানকারীদের নিয়ে সংগঠন ঃ

যারাই ইসলামী আন্দোলনের এ ডাকে সাড়া প্রদান করেন তাদেরকে নিয়েই দা'য়ী গড়ে তোলেন একটি সংগঠন। এ সংগঠন নেতা ও কর্মী সমন্বয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন করে কাজ শুরু করেন। এখান থেকেই সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী হয়ে যায়। এ সংগঠনের কর্মী সংখ্যার ব্যাপারটা প্রধান নয় বরং নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বিষয়টিই প্রধান। ধীরে ধীরে নতুন নতুন কর্মী এ ডাকে সাড়া দিতে থাকে এবং সংগঠনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়। দা'য়ী তার আহ্বানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

গ. আহ্বানের বিরোধিতা ও লোক তৈরী ঃ

আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি এই যে আহ্বান, এ আহ্বানে সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীরা কিন্তু প্রমাদ গোণে। তারা বুঝতে পারে এ আহ্বান কামিয়াব হলে তা অনিবার্যভাবে আঘাত হানবে তাদের কায়েমী স্বার্থে। তাই তারা শুরু করে এ আহ্বানের বিরোধিতা। এ আহ্বানের বিরুদ্ধে সমাজের লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে। আহ্বায়ক ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে নানারূপ ঠাট্টা-মশকারা করে, টিটকারী দেয়। এতেও আহ্বায়ক ও তার লোকেরা ক্ষান্ত না হলে শুরু হয় নানামুখী অত্যাচার ও নির্যাতন। ইসলামী বিপ্লব সাধনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব সমাজ ও দেশের লোকদের শত্রুতে পরিণত হয়।

www.bjilibrary.com

চতুর্দিক থেকে ছুটে আসে বিরোধিতা, অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয় তারা।

একদিকে দ্বীনের প্রতি গভীর বিশ্বাস, সংগঠনের প্রতি চরম আনুগত্য, অপরদিকে পরিবার ও সমাজের সবখান থেকে বিরোধিতা কর্মীকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে। এভাবে সে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। স্বর্ণ যেমন আগুনে ঝলসিয়ে নিখাদ করা হয়, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে তেমন প্রবল বিরোধিতা ও অত্যাচার নির্যাতনের পরীক্ষা খাঁটি কর্মীতে পরিণত করে। এ ছাড়া ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস ও তদনুরূপ আমলের ট্রেনিং-এর মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত প্রতিটি কর্মীকে গড়ে তোলা হয়। এভাবেই ইসলামী আন্দোলনে লোক তৈরীর এক চিরন্তন কর্মপদ্ধতি চালু রয়েছে।

ঘ. সংগঠনের প্রসার ও মজবুতি, চরম বিরোধিতা, হিজরত ও মোকাবেলা ঃ

বিরোধিতা সত্ত্বেও যদি দ্বীনের পথের পথিকগণ থাকে দৃঢ় ও মজবুত, তাহলে সংগঠনের প্রসার ঘটে ধাপে ধাপে এবং সাথে সাথে সংগঠনের মজবুতিও সৃষ্টি হয়। এর ফলে বিরোধী শক্তি চরমভাবে ক্ষেপে ওঠে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অত্যাচার-নির্যাতন চালায়, এমনকি হত্যা ও চরমভাবে নির্মূল করার উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় আল্লাহর পথের সৈনিকদের টিকে থাকা হয়ে পড়ে কঠিন, প্রয়োজনবোধে তারা হিজরত করে চলে যায় নিরাপদ আশ্রয়ে। এতেও কিন্তু বিরোধিতা বন্ধ হয় না, হুমকি আসে সমূলে বিনাশ করার। ফলে বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র মোকাবেলারও সম্মুখীন হতে হয়।

ঙ. আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ঃ

এমনিভাবে ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত কর্মীরা তৈরী হয়, প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ বলে প্রমাণ পেশ করে, বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যায় এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। ফলে আল্লাহর সাহায্য যখন এগিয়ে আসে, বিজয় তখন তাদের পদচুম্বন করে, ইসলামী বিপ্লব সাফল্যের পথে এগিয়ে চলে।

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল– ইসলামী বিপ্লবের কর্মপদ্ধতি হলো দাওয়াত, সংগঠন, লোক তৈরী, বিরোধিতা, অত্যাচার, নির্যাতন, ষড়যন্ত্র ও হিজরত, মোকাবেলা, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

সংগঠন পদ্ধতি ঃ

ইসলামী বিপ্লবের সংগঠন উপর থেকে নীচের দিক এগিয়ে যায়। আসলে ইসলামী বিপ্লবের সংগঠন আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম বা দা'য়ীর মাধ্যমে

www.bjilibrary.com

জনগণের নিকট। তাই প্রথমে আসে কেন্দ্রীয় দা'য়ী ইলাল্লাহ; অতঃপর গঠিত হয় কেন্দ্রীয় সংগঠন, এরপর ধাপে ধাপে নীচের স্তরে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটে। সংগঠন কর্মসূচী গ্রহণ করে স্তরে স্তরে তাকে চালু করে।

ঊর্ধ্বতন সংগঠন থেকে পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে অধঃস্তন সংগঠনে পৌছানো হয়। পরিকল্পনা ও কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয় অধঃস্তন সংগঠনকে। সাথে সাথে তাকিদও দেয়া হয়।

অতঃপর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রিপোর্ট গ্রহণ করা হয় কাজের এবং যথারীতি কাজের পর্যালোচনা করা হয় ও প্রদান করা হয় প্রয়োজনীয় হেদায়াত ও সংশোধনী।

এমনিভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিম্নস্থ সংগঠনে প্রেরণ, সহযোগিতা ও তাকিদ প্রদান, রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা এবং সংশোধনী ও হেদায়াত দানের মাধ্যমে সংগঠনের কাজ চলে অবিরাম।

অপরদিকে সমর্থক–সহযোগী সৃষ্টি, কর্মী তৈরী, কর্মীদেরকে অগ্রসর করা ও সদস্য করার কাজ নিচ থেকে উপরের দিকে এগিয়ে চলে এবং এ সবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কর্মসূচী-পরিকল্পনা ঃ

সংগঠনকে একটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত সংগঠনকেও বিপ্লবের সহায়ক একটি কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয় বরং তার থাকে একটি স্থায়ী কর্মসূচী।

স্থায়ী কর্মসূচী ঃ

ক. তাবলীগ ও দাওয়াত ঃ

কর্মসূচীর প্রথম বিষয়টিই হল তাবলীগ ও দাওয়াত অর্থাৎ ইসলামী জীবন-বিধানকে জনগণের নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং তার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো। ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত নেতা ও কর্মীগণকে জনগণের নিকট পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ইসলামকে তার বিভিন্ন দিক ও বিভাগসহ সুস্পষ্টভাবে পেশ করতে হবে, কুরআন-হাদীসের ব্যাপক চর্চা করতে হবে, বিভিন্ন যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হবে ইসলামী আদর্শের আলোকে, সাথে সাথে দেশ, জাতি ও সমাজের লোকদের প্রতি ডাক দিয়ে বলতে হবে ঃ

হে দুনিয়ার মানুষরা, আসুন, আমাদের স্রষ্টা প্রভু ও মনিব, নিখিল বিশ্বের মালিক মহান আল্লাহ তায়ালার গোলামী ও দাসত্ব কবুল করি। কেবলমাত্র তারই গোলামী করতে হবে, অন্য কোন সত্তা, পদার্থ বা ব্যক্তির গোলামী মানুষ করতে পারে না।

www.bjilibrary.com

এবং তারই সাথে আসুন নেতৃত্ব কবুল করি একমাত্র বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর। নেতৃত্ব ও আনুগত্য কেবলমাত্র তারই করা যেতে পারে।

হে মুসলমানেরা, আসুন আমরা আল্লাহর বিধান পুরাপুরি মেনে চলি, খাঁটি মুসলমান হই। আমরা মুখে বলব আল্লাহ মানি, রাসূল মানি, কিতাব মানি, দ্বীন মানি, কিন্তু বাস্তব জীবনে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কাজে নিয়োজিত হব– এমনটা যেন না হয়। কথা ও কাজে গড়মিল– সে তো মুনাফিকীর লক্ষণ। সেই মুনাফিকীর লক্ষণ যেন আমাদের জীবনে প্রকাশ না পায়– এমন জীবন আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

হে ইসলামী বিপ্লবের ডাকে সাড়া প্রদানকারী ভাইয়েরা, আসুন আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে দ্বীনের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করি। অসৎ, ফাসেক, ফাজের নেতৃত্বের কারনে সমাজে যে অন্যায়, অবিচার, জুলুম নির্যাতন, শোষণ–বঞ্চনা চলছে তার অবসানকল্পে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাই এবং সে সংঘবদ্ধ প্রচষ্টার মাধ্যমে অসৎ ও ফাসেক নেতৃত্ব খতম করে সৎ, যোগ্য ও ঈমানদার লোকদের নেতৃত্ব কায়েম করি।

তাবলীগ ও দাওয়াতের এ কাজে বিভিন্নমুখী পন্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতা-বিবৃতি, সভা-সমিতি, সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা বিতরণ, প্রোগ্রাম-সিম্পোজিয়াম, ওয়াজ মাহফিল ও সিরাতুন্নবী ইত্যাদি বিভিন্নমুখী দাওয়াতী প্রোগ্রাম গ্রহণ করা যেতে পারে। এর সাথে ব্যক্তিগত ও গ্রুপভিত্তিক যোগাযোগ, টার্গেট ভিত্তিক যোগাযোগ– এ ধরনের বহুমুখী কর্মসূচী পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করতে হয় তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজের জন্য।

খ. সংগঠন ও প্রশিক্ষণ ঃ

কর্মসূচীর দ্বিতীয় কাজ হলো বিভিন্নমুখী দাওয়াতের ফলে যারা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাদেরকে সংগঠনভুক্ত করণ, তাদেরকে সু-সংগঠিত করণ ও তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলা। গঠনতন্ত্রের আলোকে সংগঠন গড়ে ওঠে, সহযোগী থেকে সদস্য করণ পর্যন্ত একটি প্রক্রিয়া চালু করা হয়। সহযোগী-সমর্থক তো যে কোন ব্যক্তিই হতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র কতিপয় শর্ত পূরণ হলেই সদস্য করা হয়। এসব শর্তাবলীর মধ্যে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, আদর্শের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার, সংগঠন ও গঠনতন্ত্রের আনুগত্য- এসব জরুরী।

এভাবে ইসলামী বিপ্লবের জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলা অপরিহার্য। এ সংগঠন গড়ে তোলা যেমন কষ্টসাধ্য, তাকে মজবুত করাও তেমনি কঠিন। কিন্তু সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত জনশক্তিকে যথার্থ প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা আরো কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই কঠিন ব্যাপারটি ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য একান্তই অপরিহার্য।

www.bjilibrary.com

সংগঠনকে তাই বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বরং দৈনন্দিন কার্য পরিক্রমার মধ্যেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এছাড়া কুরআন-হাদীসের জ্ঞানার্জন, বক্তৃতা দেয়া, লোকদেরকে বুঝানো, ঈমানী মজবুতি অর্জন, চরিত্র গঠন– ইত্যাদি প্রশিক্ষণ লাভের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ইসলামী বিপ্লবের জন্য এমনি ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনীসহ একটি মজবুত সংগঠন প্রয়োজন।

গ. সমাজ বিপ্লব ঃ

ইসলামী বিপ্লব যে ব্যাপক বিপ্লব ঘটাতে চায় দাওয়াতের মাধ্যমে একটি সংগঠন গড়ে তুলে প্রাথমিক পর্যায়ে তা একটি সমাজ বিপ্লবের পদক্ষেপ নেয়।

এই সমাজ বিপ্লবে প্রধানতঃ তিন ধরনের কাজের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

১. সামাজিক সংশোধন
২. সাংস্কৃতিক বিকাশ ও বিপ্লব
৩. সমাজ সেবা।

১. সামাজিক সংশোধন–

সামাজিক পর্যায়ে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর কর্মসূচীর ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। সমাজে ভালো কাজসমূহের প্রচলন ও খারাপ কাজসমূহ বন্ধ রাখার মাধ্যমে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা হয়। সমাজের শিরক-কুসংস্কার, হারাম-মাকরূহ ও নাজায়েয কাজসমূহ বন্ধ করে ফরজ-ওয়াজিব, সৎ ও ভালো কাজসমূহ যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম করে সেগুলো চালু করেই সামাজিক সংশোধন সম্ভব। এসব সামাজিক সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে নেমে আসে শান্তি-শৃংখলা ও সুন্দর পরিবেশ।

২. সাংস্কৃতিক বিকাশ ও বিপ্লব–

আধুনিক সভ্যতা সমাজকে উপহার দিয়েছে একটি কু-রুচিপূর্ণ নগ্ন সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে এক বিকৃত চেতনার সৃষ্টি করেছে কু-রুচিপূর্ণ নাচ-গানের মাধ্যমে। সিনেমা-থিয়েটার, অডিও-ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে তা ব্যাপকতা লাভ করেছে চরমভাবে। আর তার সহায়তায় এগিয়ে এসেছে রেডিও, টেলিভিশন–জাতীয় শক্তিশালী গণমাধ্যমমূলক প্রচারধর্মী যন্ত্রগুলো। ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য এসব কু-রুচিপূর্ণ সংস্কৃতির পরিবর্তন করে সু-রুচিপূর্ণ সংস্কৃতির বিকাশ একান্তভাবে কাম্য। কুরআন তেলাওয়াত, কুরআন-হাদীসের আলোচনা, সীরাতুন্নবী আলোচনা, ওয়াজ-নসিহত, সমাজের উপকারী আলোচনা, কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞানের উপকারী আলোচনা, ইসলামী সংগীত-এ সবের মাধ্যমে ইসলামী বিকাশ ঘটানো যায়। সাংগঠনিক ও সামাজিক শক্তির আলোকে যতটুকু

www.bjilibrary.com

সম্ভব সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনে ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত সংগঠন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৩. সমাজ সেবা –

সামাজিক বিপ্লবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজের বঞ্চিত-অসহায়ও গরীব মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা দান। যাকাত ও ওশরের ব্যবস্থার মাধ্যমে এ কাজ সু-সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। ইসলামী বিপ্লব সাধনের পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যবস্থার বেশী বেশী প্রচলনসহ সমাজের অসহায় মানুষের জন্য যতটুকু সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয় ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত সংগঠন।

ঘ. রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঃ

একটি দেশের পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব নির্ভর করে রাষ্ট্রের বিপ্লবের উপর। রাষ্ট্রই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করে। বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সংস্কারের চূড়ান্ত ক্ষমতাও থাকে রাষ্ট্রেরই হাতে। তাই কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের মাধ্যমেই চূড়ান্তভাবে ইসলামী বিপ্লব সাধন করা সম্ভব।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের জন্য কেবলমাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং সমাজের সর্বক্ষেত্রে ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব চালু হওয়া দরকার। একটি ইসলামী সরকারের সাথে সাথে তেমন একটি নেতৃত্ব কাঠামো চালু হলেই রাষ্ট্রীয় বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করবে।

ইসলামী বিপ্লব সাধনে নিয়োজিত একটি সংগঠন এই চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সাধনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যায়।

পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ঃ

ইসলামী আন্দোলন যখন বিস্তার লাভ করে, কাজের পরিধি তখন বেড়ে যায়। ফলে মূল সংগঠনের সাথে অঙ্গ সংগঠন, পার্শ্ব সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে অনেক কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়। তাই ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপক কাজের লিখিত সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রে নেয়া যায় না। কিন্তু মূল সংগঠনের কার্যক্রমের পরিকল্পনা নেয়া অপরিহার্য।

পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সীমিত শক্তি ও সম্পদ দ্বারা সর্বাধিক ফল লাভ। সংগঠনের অধীন যে সম্পদ ও শক্তি আছে তা যদি সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে বেশী ফল পাওয়া যাবে এটা নিশ্চিত।

পরিকল্পনাহীন কাজ মানে এ কাজের কোন টার্গেট বা উদ্দেশ্য নেই। অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিহীন কাজ। যে কাজ উদ্দেশ্য বা টার্গেট বিহীন সে কাজের কোন হিসাব নিকাশ হয় না, ফলে সে কাজের কোন অগ্রগতিও আশা করা যায় না।

www.bjilibrary.com

পরিকল্পনা একটি technical বিষয়। সংগঠন তার পরিকল্পনায় এ technical বিষয়গুলো বুঝে নিয়ে সুন্দর ও যথার্থভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ইসলামী বিপ্লবের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতার হাত বদল নয়, বরং সমাজ কাঠামোর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সমাজ কাঠামোর এই পরিবর্তন সাধন মানেই বিপ্লব ঘটানো। এ কাজ অনেক বিরাট কাজ। লিখিত ও অলিখিত পরিকল্পনা ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়।

পরিকল্পনা কি?

পরিকল্পনার সূচনা হয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে-সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায়। দেশের গোটা উৎপাদন উপায়কে রাষ্ট্রের করায়ত্ব করার পর ঐ উৎপাদন উপায় ও সম্পদের দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে পরবর্তী পর্যায়ে পুঁজিবাদী দেশেও রাষ্ট্রীয় ও প্রাইভেট সেক্টরের সম্পদের পাঁচশালা, দশশালা পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

পরিকল্পনা মানে ধাপে ধাপে কোন লক্ষ্যে পৌছার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ প্রাপ্ত উপায় উপকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি সময়ে মাত্রায় পৌছার টার্গেট গ্রহণ ও লক্ষ্যে পৌছার চেষ্টা। তাই পরিকল্পনার জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য।

১. সময়সীমা নির্ধারণ– দশশালা, পাঁচশালা, বার্ষিক।

২. উপায় উপকরণের যথাযথ রিপোর্ট, প্রয়োজনীয় সার্ভে ও হিসাব নিকাশ।

৩. লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

১. পরিকল্পনার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ এক অপরিহার্য প্রয়োজন। সময়সীমা নির্ধারণ ছাড়া কোন পরিকল্পনা হতেই পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাঁচশালা, দশশালা পরিকল্পনাও নেয়া হয়, তবে সাম্প্রতিক পাঁচশালা পরিকল্পনাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পাঁচশালা পরিকল্পনাকে আবার বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করা হয়। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর করা যায় না।

অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী কিছু অলিখিত পরিকল্পনাও থাকতে পারে। কিন্তু লিখিত পরিকল্পনা বার্ষিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রেক্ষিতে এটাই সবচে' যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। অনেক সময় ঘটনা চক্রের কারণে এ বার্ষিক পরিকল্পনাও ব্যাহত হয়। পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্যই এমনটি হয়। যাই হোক, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ পর্যন্ত মূল সংগঠনের বার্ষিক পরিকল্পনাই নিয়ে আসছে।

২. উপায়-উপকরণের যথার্থ রিপোর্ট ও প্রয়োজনীয় সার্ভের ক্ষেত্রে সংগঠনের উপায়-উপকরণ হলো জনশক্তি, বায়তুলমাল শক্তি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। জনশক্তির রিপোর্ট অনেক সময় যথার্থ হয় না, গড়মিল থাকে। যথার্থ মানে কর্মী

www.bjilibrary.com

হয়নি তবু কর্মী হিসাবে গণ্য করা, ইউনিট মান মোতাবেক সক্রিয় হয়নি তবু তাকে সক্রিয় গণনা করা-এ ধরনের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরী করা হলে পরিকল্পনা অবশ্যি দুর্বল হবে, কারণ তার ভিত্তি দুর্বল। এ জন্য প্রয়োজন যথার্থ সার্ভের।

পরিকল্পনা গ্রহণের আগের মাসগুলোতে যথার্থ সার্ভের মাধ্যমে প্রকৃত কর্মী, সক্রিয় ইউনিট, বায়তুলমালের আয়-ব্যয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঠিক চিত্র সংগ্রহ করতে হবে। কেবলমাত্র এটা সম্ভব হলেই একটি যথার্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব।

৩. প্রাপ্ত উপায়-উপকরণ নির্দিষ্ট সময় শেষে কি ফল দিতে পারে বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা তা নির্ধারণ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা খুব অতিরঞ্জিত কিছু হওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনি মোটেই কষ্টসাধ্য নয় এমন লক্ষ্য মাত্রা ধার্যও যথার্থ নয়। বাস্তবধর্মী লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে কাজে এগুতে হবে।

জামায়াতের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ঃ

পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য হলো কর্মসূচী বাস্তবায়ন। জামায়াতে ইসলামীর চার দফা স্থায়ী কর্মসূচী রয়েছে। সংক্ষেপে সে গুলো হলো ঃ

১. দাওয়াত ও তাবলীগ।
২. সংগঠন ও প্রশিক্ষণ।
৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংশোধন ও সমাজসেবা।
৪. রাষ্ট্রীয় সংশোধন এবং সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েম।

পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ ভারসাম্য মূলকভাবে যাতে চারটি দফায় নিয়োজিত হয় সেভাব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জিলা থেকে নিচের দিকে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক চরিত্রের অভাব দেখা দিতে পারে। অতি সাংগঠনিক বা অতি রাজনৈতিক চরিত্রের অধিকারী নেতৃত্বকে ভারসাম্যমূলক পরিকল্পনা ভারসাম্যময় অবস্থায় আনতে সাহায্য করতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বার্ষিক পরিকল্পনা চার দফা-স্থায়ী কর্মসূচীর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তাই ভারসাম্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

পরিকল্পনা গ্রহণ ঃ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রথমে কেন্দ্রীয়ভাবে পুরো বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিগত বছরগুলোর পরিকল্পনা, তার লক্ষ্য ও টার্গেট অর্জন, প্রাপ্ত সাংগঠনিক রিপোর্ট ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়। প্রথমে পরিকল্পনা কমিটি খসড়া তৈরী করে, কর্মপরিষদে খসড়া গৃহীত হলে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

www.bjilibrary.com

জিলা ও উপজিলা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও একটি কমিটি প্রথমে খসড়া তৈরী করে। পরে সংশ্লিষ্ট সংস্থা আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত রূপ দান করে। এ পর্যায়ে পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে সব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয় তা হলো ঃ

ক. মূল (কেন্দ্রীয়) পরিকল্পনার লক্ষ্য ও দিক নির্দেশনা।
খ. জিলার জনশক্তি ও সাংগঠনিক শক্তির যথার্থ রিপোর্ট।
গ. সংশ্লিষ্ট এলাকার পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত অবস্থান।
ঘ. পূর্বেকার বছরগুলোর অগ্রগতির হার।

এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিটি একটি পরিকল্পনা তৈরী করবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করবে।

কিছু স্থায়ী বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ঃ

চার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দফাওয়ারী কিছু স্থায়ী বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা সংশ্লিষ্ট মহলের জন্য উপকারী হতে পারে। নিম্নে সে ধরনের দফাওয়ারী আলোচনা পেশ করা হল।

ক. দাওয়াত ও তাবলীগ ঃ

প্রধানতঃ পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা যেতে পারে।

১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াতের মাধ্যমে।
২. বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে।
৩. সাহিত্যের মাধ্যমে।
৪. পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে।
৫. অডিও, ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে

১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত প্রদান

আন্দোলনের সক্রিয় শক্তি ব্যক্তিগত টার্গেট নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াতের কাজ করে যেতে পারেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটি অবশ্যি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ ব্যাপারে উপজিলা পর্যায়ে বছরের শুরুতেই পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। প্রতি জনশক্তি প্রতি মাসে চারজন লোকের সাথে দাওয়াতী সাক্ষাৎ করবেন-এ হিসেবে টার্গেট নেয়া যেতে পারে। প্রতি মাসের পর্যালোচনায় দেখা যাবে টার্গেট কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। ইউনিয়ন ও ইউনিটকেও এভাবে পরিকল্পনা ও টার্গেট নিয়ে কাজ করতে হবে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াতী কাজের ব্যাপারে গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কাজও

www.bjilibrary.com

উল্লেখযোগ্য। প্রতিমাসে দু'সপ্তাহে প্রতি ইউনিটে গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কাজ হওয়ার কথা। এ হিসেবে প্রতিমাসে কতটি গ্রুপ বের হতে পারে তার টার্গেট উপজিলা পর্যায়ে নিয়ে উক্ত প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে।

২. বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান

দাওয়াতী বেঠকের আলোচনার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান একটি উত্তম পদ্ধতি। এ পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাসিক বৈঠক (সাধারণ সভা), সুধী সভা, আলোচনা সভা, ওয়াজ মাহফিল, সিরাতুন্নবী মাহফিল, ইসলামী দিবস পালন, চা-চক্র, ইফতার পার্টি-এসব প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য। ইউনিট ও ইউনিয়নের পরিকল্পনাকে সামনে রেখে উপজিলা বছরের শুরুতেই এসব ব্যাপারে বিস্তারিত পরিকল্পনা নিতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারলে ব্যাপক দাওয়াতী কাজ হতে পারে।

৩. ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ

ইসলামী সাহিত্য দাওয়াতের এক বিরাট মাধ্যম। কেন্দ্রীয়ভাবে এসব ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়। নিম্নস্থ সংগঠনের দায়িত্ব হল এসব বই-পুস্তক সাধারণ মানুষের নিকট পৌছানো। এ পর্যায়ে যেসব পদক্ষেপ নেয়া জরুরী সেগুলো হল ঃ

ক. ব্যক্তিগতভাবে বই রাখা ও পড়ানো।
খ. ইউনিট লাইব্রেরীতে বই রাখা ও পড়ানো।
গ. ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।
ঘ. বই বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা।
ঙ. ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রি।

এছাড়া নিজ নিজ এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও পাবলিক লাইব্রেরীসমূহে কখন বই কেনা হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার। এসব পাঠাগারে বেশী বেশী আন্দোলনী বই সরবরাহের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং সম্ভব হলে বই ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। চটি বইয়ের চাইতে অপেক্ষাকৃত দামী ও সহায়ক বই ব্যক্তিগতভাবে অনেক কর্মীর পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন। এ ধরনের বই এসব লাইব্রেরীর মাধ্যমে সংগ্রহ করে নেয়া যায়।

জিলা বা উপজিলা পর্যায়ে এইসব ব্যাপারে টার্গেটসহ পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। এসব ব্যাপারে অগ্রগতি হলে দাওয়াতী কাজ বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে।

৪. পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ

আন্দোলনের সহায়ক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দেশের সচেতন জনগণের মধ্যে দাওয়াতী কাজ বৃদ্ধি পায়। তাই

www.bjilibrary.com

এসব পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির টার্গেট নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. অডিও, ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ

আধুনিক যুগে প্রচারের ক্ষেত্রে অডিও, ভিডিও ক্যাসেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী গণমাধ্যম। সমাজের শিক্ষিত মানুষ কর্মময় জীবনের ব্যস্ততা বা মানসিক অস্থিরতার কারণে মনোযোগ দিয়ে বই-পুস্তক পড়ার সময় পান না। আর যারা লেখাপড়া জানেন না তারা তো বই-পত্র পড়তেই পারেন না-সেক্ষেত্রে অডিও, ভিডিও ক্যাসেট নির্বিঘ্নে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে ভাব ও বক্তব্য। সহজ মননশীলতার ভিত্তিতে ইসলামের বিভিন্নমুখী ভাব ও বক্তব্যের দাওয়াত অডিও, ভিডিও ক্যাসেটে ধারণ করে তা শিক্ষিত ও গণমানুষের কাছে উপস্থাপন করতে পারলে দাওয়াতের ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে। ইসলামী বিপ্লবের জন্য গণজাগরণ সৃষ্টি ও জনশক্তিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য অডিও, ভিডিও ক্যাসেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এর জন্য যেমন কেন্দ্রীয়ভাবে এসব ক্যাসেট তৈরী প্রয়োজন, তেমনি জনশক্তির মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার।

এছাড়া দাওয়াতী সপ্তাহ পালন, দাওয়াতী অভিযান পরিচালনা, কোন কোন ইউনিয়নে বা গ্রামে দাওয়াতী গ্রুপ প্রেরণ এসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

খ. সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

সংগঠন পর্যায়ে জনশক্তির হারওয়ারী পরিকল্পনা জিলা ও উপজিলাকে নিতে হবে। রুকন, কর্মী ও সহযোগী সদস্যের টার্গেটভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।

প্রশিক্ষণ পর্যায়ে ইউনিট বা ইউনিয়নভিত্তিক শিক্ষা বৈঠকের পরিকল্পনা নিতে হবে উপজিলাকে। উপজিলা ও জিলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবিরের পরিকল্পনা নিতে হবে জিলাকে।

গ. সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার

সমাজ সেবা পর্যায়ে উপজিলায় দাতব্য চিকিৎসায়, এতিমখানা, আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। অবশ্য পরিকল্পনা বাস্তবমুখী হতে হবে। খরচের সাথে আয়ের ব্যবস্থাও পরিকল্পনায় নিতে হবে। ইউনিট বা ইউনিয়ন ভিত্তিক দু'একটা সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। বিধবা পুনর্বাসন, পুল বা সাঁকো নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান-এ ধরনের এক বা একাধিক প্রোগ্রামের পরিকল্পনা নেয়ার টার্গেট ইউনিয়নকে দেয়া যেতে পারে। পরিস্থিতি-পরিবেশ, সাংগঠনিক শক্তি ও অর্থ

www.bjilibrary.com

শক্তির সাথে সংগতি রেখে সমাজ সংস্কার, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজের ও পরিকল্পনা নেয়া দরকার।

ঘ. রাজনৈতিক কার্যক্রম

রাজনৈতিক কার্যক্রমের সু-নির্দিষ্ট টার্গেট নিম্নস্থ সংগঠনের পক্ষে নেয়া কঠিন। কেন্দ্র ঘোষিত দিবসাদি পালন, জনসভা ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়ার কথা পরিকল্পনায় থাকতে পারে। অবশ্য প্রশাসনের সাথে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগের টার্গেট পরিকল্পনায় থাকা উচিত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্র থেকে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় তা সামগ্রিকভাবে গোটা সংগঠনেরই জন্য। এ জন্য বিভিন্ন স্তরে আলাদা আলাদা লক্ষ্য নির্ধারণ বা লক্ষ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি গবেষণায় নিম্নস্থ সংগঠনের নিয়োজিত না হওয়াই উচিৎ।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সুন্দর করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণই কিন্তু কাজ নয়, বড় কাজ হলো পরিকল্পনার যথার্থ বাস্তবায়ন। আসলে পরিকল্পনা প্রণয়ন তো করতে হবে বাস্তবায়নেরই লক্ষ্যে। এ জন্য কেন্দ্র থেকে উপজিলা পর্যন্ত পরিকল্পনার কপি সরবরাহ করা সম্ভবপর নয়। কারণ স্ব-স্ব এলাকার অবস্থা ও রিপোর্টের ভিত্তিতে নিজের পরিকল্পনা নিজেরই তৈরী করতে হবে। এর জন্য জুতার ফর্মার মতো কোন ফর্মা নেই।

পরিকল্পনা নজরে রাখা

পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর যদি এর কপি যত্ন সহকারে ফাইল-বন্দী করে রাখা হয়, সাংগঠনিক কাজ-কর্মে পরিকল্পনা, তার টার্গেট ইত্যাদির কোন খোঁজ-খবর রাখা না হয় তাহলে সুন্দর পরিকল্পনা কোনই ফল দিবে না। যথার্থ ফল লাভের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনাকে সময় সময় দেখা, এর টার্গেট খেয়াল রাখা।

পরিকল্পনা পর্যালোচনা

পরিকল্পনা যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য সময় সময় পরিকল্পনার পর্যালোচনা একান্তভাবে জরুরী। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সার্বিকভাবে বছরে একবারের বেশী সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনা করা যায় না। কিন্তু জিলা পর্যায়ে প্রতি তিন মাসে পরিকল্পনার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পর্যালোচনায় যেসব বিষয়ে এ তিন মাসে টার্গেট পূর্ণ হয়নি দেখা যাবে, সেগুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে টার্গেট পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।

উপজিলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিমাসে পরিকল্পনার আলোকে কি কাজ হলো আর

www.bjilibrary.com

কি কাজ হলো না তা দেখা কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এখনো যেন আমাদের সাংগঠনিক জনশক্তির উক্ত কাজগুলো রপ্ত হচ্ছে না। এজন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা দরকার তা হচ্ছে–

ক. মাসিক বৈঠকের পূর্বে পরিকল্পনার কপি দেখা, যাতে সামনের মাসে বিশেষ করণীয় কি তা জানা থাকে।

খ.উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল নিম্নস্থ সংগঠনের পরিকল্পনা যথারীতি বাস্তবায়িত করছে কিনা তার সঠিক তদারক করা।

পরিকল্পনার বিশেষ করণীয়

পরিকল্পনার ব্যাপারে কেন্দ্র বিভিন্ন পরিশিষ্টের মাধ্যমে জিলা ও অধঃস্তন সংগঠনের করণীয় কি তা জানিয়ে দেয়। সেগুলো যথার্থভাবে পালন করা দরকার। তেমনিভাবে জিলা অধঃস্তন সংগঠনকে প্রয়োজনীয় হেদায়েত পাঠাতে পারে, তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন

বছর শেষে জিলা ও উপজিলাকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রিপোর্ট তৈরী করতে হয়। রিপোর্ট তৈরীর ব্যাপারটি পূর্ব থেকে খেয়াল রেখে প্রয়োজনীয় নোট রাখতে পারলে রিপোর্ট তৈরী সহজ হবে। এই রিপোর্ট তৈরী করে উর্ধ্বতন সংগঠনে যেমন জমা দিতে হবে, তেমনি নিজস্ব সংগঠনে তার বিস্তারিত পর্যালোচনা হওয়া দরকার। বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ করে আসল তত্ত্ব বের করতে হবে। যথেষ্ট সময় নিয়ে এর জন্য বিশেষ বৈঠক হওয়া প্রয়োজন।

বার্ষিক রেকর্ড সংরক্ষণ

পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক তথ্যাদির বার্ষিক রেকর্ড সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনশক্তি ও সাংগঠনিক শক্তির বিভিন্ন আইটেমের বার্ষিক পরিসংখ্যান একটি রেজিষ্ট্রারে যথারীতি সংরক্ষণের মাধ্যমেই এ কাজ করা যেতে পারে। পূর্ব থেকে এ ধরনের রেজিষ্ট্রার না থাকলে চলতি বছর থেকে তা শুরু করা দরকার।

৫. তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও তার ব্যবহার

ইসলামী বিপ্লব কোন কথার ফানুস নয়, নয় তা কেবলমাত্র কিছু ওয়াজ-নছিহত বা একটি দোয়ার মাহফিল। এ হলো আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে ব্যক্তি, পরিবার,

www.bjilibrary.com

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক ব্যাপক কর্মসূচী। এর জন্যে দরকার কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। দুনিয়ার কোন কর্মসূচী ও পরিকল্পনা অর্থ বা টাকা-পয়সা ছাড়া বাস্তবায়িত করা যায় না। তাই ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সংগঠন পরিচালনা, কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যেও প্রয়োজন যথেষ্ট অর্থের। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা ইসলামী বিপ্লবের জন্যে জান ও মালের আহবান রেখেছেন পাক - কুরআনে মুমিনদের কাছে।

تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ-

অর্থ ঃ "জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের জান দ্বারা।' (সূরা ছফ ঃ আয়াত ১১)

কুরআনের যেখানেই জিহাদের কথা বলা হয়েছে সেখানেই মুমিনের জান ও মালের দু'টোই চাওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা মুমিনের জান ও মালের বিনিময়ে আখিরাতে জান্নাত দান করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনের নিকট থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন।' (সূরা আত তাওবা আয়াত ১১১)

এর ফলে আল্লাহর পথে জিহাদের (ইসলামী বিপ্লবের) জন্যে অর্থের প্রয়োজন হলে মুমিন তার নিকট গচ্ছিত আল্লাহর মাল থেকে নির্দ্বিধায় খরচ করেন, প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেন।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। এ যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে একটি খাত আল্লাহর পথে খরচ। নিঃসন্দেহে এই আল্লাহর পথে খরচ মানে ইসলামী বিপ্লবে নিয়োজিত জিহাদে খরচ করা।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল, ইসলামী বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজনীয় তহবিল গঠিত হবে বিপ্লবেরই সদস্য-সহযোগীদের নিকট থেকে এবং অপরিহার্যভাবেই তা গঠিত হতে হবে।

এ থেকে বুঝা গেল, ইসলামী বিপ্লবের বিরোধী মহল থেকে এ অর্থ সংগ্রহ করা যাবে না। কারণ, তাতে কোন স্বার্থ-চিন্তা বা ষড়যন্ত্র থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই কেবলমাত্র ইসলামী বিপ্লবের সহায়ক জনশক্তির নিকট থেকেই বিপ্লব পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের তহবিল গঠন করতে হবে অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনের

www.bjilibrary.com

সদস্য, কর্মী, সহযোগী, সমর্থক ও শুভাকাঙ্খীদের নিকট থেকে এ অর্থ জোগাড় করতে হবে। এর জন্যে মাসিক ও এককালীন আদায়, যাকাত-ওশর সংগ্রহ, বিশেষ কাজ ও প্রজেক্টের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় ও অন্যান্য বৈধ পন্থায় অর্থ সংগ্রহ করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফান্ড গঠনের উপর ইসলামী বিপ্লবের জন্যে নেয়া কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

এভাবে গঠিত তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাও নিতে হবে সংগঠনকেই। প্রয়োজনীয় ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার ব্যবহার নীতি ও বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

তাই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তহবিল গঠন, তার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, ব্যবহার-নীতি প্রণয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ - ইসলামী বিপ্লবের জন্যে এক অপরিহার্য প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

ইসলামী বিপ্লব ঃ
আল্লাহর সাহায্য ও সংগঠন

ইসলামী বিপ্লবের জন্য সংগঠনের গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে এ পর্যন্তকার আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ত্যাগী কর্মীবাহিনী সমন্বিত একটি মজবুত সংগঠন ইসলামী বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু একটি মজবুত সংগঠন নিজে নিজেই ইসলামী বিপ্লব সাধন করে ফেলতে পারে না, এর জন্য একটি চূড়ান্ত শর্ত রয়েছে। তা হলো আল্লাহর সাহায্য। বস্তুতঃ ইসলামী আন্দোলন নিয়োজিত থাকে আল্লাহরই দ্বীন কায়েমে। ফলে দ্বীনের বাস্তবায়ন একান্তভাবেই নির্ভর করে আল্লাহর মর্জি ও সাহায্যের উপর।

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ঃ

কুরআন ঘোষণা করে ঃ

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ-

"আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসলে বিজয় নিকটবর্তী হয়।" (সূরা ছফ ঃ ১৩)

বরং আরো পরিষ্কার ভাষায় সূরা নাসর-এ বলা হয়েছে ঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে" অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য আসলে বিজয় হয়ে পড়ে অনিবার্য।

কিন্তু আল্লাহর সাহায্য কখন আসে? এর জন্য কি কোন শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন? আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকের মাধ্যমে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সূরা ছফ-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন তাদেরকে যারা লড়াই করে আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে যেন একটি সীসা গলিত প্রাচীর।" (সূরা ছফ ঃ ৪)

অর্থাৎ যখন মুমিনগণ একটি সুসংগঠিত দলে পরিণত হয়ে দলবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে রত হয় তখনই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

www.bjilibrary.com

এ থেকে নির্দ্বিধায় এ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, আল্লাহর ভালবাসা ও সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন নেতৃত্ব ও কর্মীর সকল গুণে গুণান্বিত একটি মজবুত সংগঠনের। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্ত হলো– একটি মজবুত সংগঠন।

আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির আরেকটি শর্ত হল মুমিনদের চরম অবস্থায় নিপতিত হওয়া। এ ব্যাপারে সূরা বাকারায় ২১৪নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ–

(سورة البقرة : ٢١٤)

অর্থ ঃ "তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা সহজে সহজেই বেহেশতে প্রবেশ করে যাবে।অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় কোনরূপ (বিপদ-আপদ) নিপতিত হয়নি। তাদের উপর কঠিন বিপদ-মুসিবত, চরম অর্থনৈতিক সংকট এবং কাঁপিয়ে তোলা নির্যাতন নেমে এসেছিল। এমনকি তদানীন্তন রাসূল ও তার সংগী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলে উঠেছিল ঃ কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য। বলা হয়েছিল, এমতাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।" এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, মুমিনদের সংগঠন যখন আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে চরম অবস্থায় নিপতিত হয় তখনই আল্লাহর সাহায্য আসে।

মুমিনদেরকে খেলাফত দান ঃ

আল্লাহ তায়ালা মুমিন, সালেহ-বান্দাদেরকে এই দুনিয়ায় খেলাফত দানের ওয়াদা করেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ– (سورة النور : ٥٥)

অর্থ ঃ "দুনিয়াতে খেলাফত দানের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে শর্ত আরোপ করেছেন তা হলো সত্যিকার ঈমানদার হতে হবে এবং আমলে সালেহ সম্পাদনকারী হতে হবে।" (সূরা নুর ঃ ৫৫)

আজকে দুনিয়ার বুকে কোটি কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও খেলাফত না থাকাতে বুঝা যায় আজকের দুনিয়ার মুসলমানগণ সত্যিকার ঈমানদার ও আমলে সালেহ সম্পাদনকারী নন। তাহলে প্রকৃত ঈমানদার ও আমলে সালেহ সম্পাদনকারী কে বা কারা একথা ভাল করে বুঝে নিতে হবে এবং একদল মুমিনুন সালেহুন বানাতে হবে।

www.bjilibrary.com

প্রকৃত ঈমানদার বলতে বুঝায়, আল্লাহর চূড়ান্ত ও প্রকৃত সার্বভৌমত্বসহ কিতাব, রাসূল, ফেরেশতা, আখেরাতের হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি ঈমান পোষণকারী একটি দল। যে ঈমান এই দুনিয়ায় জামায়াতবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের তাগীদ দেয়। সে ঈমান শুধু মৌখিক ঘোষণা বা স্বীকৃতিই দেয় না বরং অন্তরের বিশ্বাস সহকারে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তব আমলে তা প্রকাশ করে। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধানই মুক্তি ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে– এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুনিয়ায় ইসলাম কায়েমের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় রত করে।

দুনিয়ার বুকে ঈমানদারদের খেলাফত লাভের জন্য দ্বিতীয় যে শর্ত আল কুরআন পেশ করেছে তা হলো তাদেরকে আমলে সালেহ সম্পদনকারী হতে হবে। আরবী ভাষায় "সালাহিয়্যাত" অর্থ যোগ্যতা। এ অর্থে আমলে সালেহ মানে যোগ্যতার সাথে কর্ম সম্পাদনকারী অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের বাস্তবায়নের ব্যাপারে যোগ্যতার সাথে সকল কার্য সম্পাদনকারী ঈমানদার একটি দল দুনিয়ায় বর্তমান থাকলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার খেলাফত দানের ওয়াদা করেছেন। এই আমলে সালেহকারী মুমিনদের কার্যক্রমের উদাহরণ আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। সূরা আলে ইমরানে তাদেরকেই এ মুমিন বলা হয়েছে যারা ঃ

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا–

অর্থ ঃ "যারা হিজরত করেছে, যাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যারা আমার পথে কষ্ট স্বীকার করেছে এবং লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

বস্তুত ঃ আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য এই স্তরগুলো অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। এখানে হিজরতের কথা প্রথমে বলা হয়েছে। হিজরতের পূর্বেও কয়েকটি স্তর রয়েছে। তা হলো– ইসলামী আদর্শের প্রতি ঈমান আনা, এ পথে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের আহ্বান জানানো, কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা, অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হওয়া, অতঃপর আসে হিজরতের প্রশ্ন। হিজরতের সাথে সাথে বাড়ীঘর ত্যাগ করে আল্লাহর পথে কষ্ট স্বীকার এবং বাতিলের সাথে মুকাবিলা, লড়াই, হত্যা এবং শাহাদাত বা বিজয়।

ইসলামী বিপ্লবের পথে আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্ত এগুলোই। সূরা ছফ-এ বলা হয়েছে ঃ

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ–

www.bjilibrary.com

অর্থ ঃ "অপর একটি জিনিস যা তোমরা কামনা কর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটতম বিজয় এবং মুমিনদের জন্য সুসংবাদ।" (১৩নং আয়াত)-এর আগের আয়াতেই বলা হয়েছে ঃ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ-

অর্থ ঃ "ঈমান আন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা"– তাহলে বিজয়ের জন্য শর্ত হলো জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে চূড়ান্ত জিহাদ।

বদরের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ঃ

বদরের ময়দানে এমনি লড়াইয়ে আল্লাহর সাহায্য আসার কথা আল্লাহ এভাবে জানিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১২৩-১২৬)

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ- اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ- بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ- وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ، وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ-

"ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন অথচ তখন তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। অতএব খোদার না-শোকরী হতে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আশা করা যায় যে, এখন তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা ঈমানদার লোকদের বলছিলে ঃ তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে আল্লাহ তিন হাজার ফেরেস্তা অবতরণ করিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন? নিশ্চয়ই তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর, খোদাকে ভয়-ভীতিসহ কাজ কর, তবে যে মুহূর্তে শত্রুগণ তোমাদের উপর চড়াও হবে ঠিক সে মুহূর্তে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। এ কথা আল্লাহ তায়ালা এ জন্য জানিয়ে দিচ্ছেন যেন তোমরা সন্তুষ্ট হও এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ জয়লাভ ও সাহায্য যা কিছু হয় সবই আল্লাহর তরফ হতেই হয়, যিনি বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞানী।"

www.bjilibrary.com

বদরের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ সাহায্য প্রাপ্তির জন্য যেসব শর্ত আরোপ করলেন তা হলো ঃ

১. না-শোকরী থেকে দূরে থাকতে হবে।
২. আন্দোলনের যে পরিস্থিতিই থাকুক না কেন বিরোধী শক্তি সম্মুখ সমরে বাধ্য করে ফেললে আল্লাহর শোকর আদায় করে হিম্মতসহ এগিয়ে যেতে হবে।
৩. আল্লাহর সরাসরি সাহায্যের আশা পোষণ করতে হবে।
৪. ধৈর্য ধারণ করতে হবে, পেরেশান বা অস্থির হয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করে হুলুস্থুল করা ঠিক হবে না।
৫. তাকওয়ার ভিত্তিতে কার্যক্রম চালাতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করতে হবে।
৬. মনে রাখতে হবে সাহায্য এবং বিজয় কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসতে পারে, যিনি সর্বশক্তিমান ও সুবিজ্ঞ।

বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে সূরা আনফালের ১০নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ الْحَكِيْمِ-

"সাহায্য কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট থেকেই আসে, তিনি মহা ক্ষমতাশালী ও সুবিজ্ঞও।"

আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে এমন আশা করা জায়েয নয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা হজ্জে এ ব্যাপারে শক্ত কথা বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاۤءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيْظُ-

"যে ব্যক্তি ধারণা করে যে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কোন সাহায্য করবে না তার উচিৎ একটি রশির সাহায্যে আকাশ পর্যন্ত পৌছে তাতে ফাটল ধরিয়ে দেয়া। এর পর সে দেখুক তার কৌশল তার কোন দুঃসহ অপছন্দনীয় জিনিস প্রতিরোধ করতে পারে কিনা।" (সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১৫)

সূরা তাওবার ৭৪নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَانَصِيْرٍ-

"এই দুনিয়ার বুকে তাদের জন্য আর কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।"

www.bjilibrary.com

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিন বান্দার বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ঃ

فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

"জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী।" (সূরা আনফাল ঃ ৪০)

বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে সূরা আনফালের ১৭নং আয়াতে আল্লাহ নিজে শত্রু-শক্তিকে আঘাত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى-

"তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি বরং আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং যা নিক্ষেপ করেছ তা তুমি নিক্ষেপ করোনি আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।"

ওহুদের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ঃ

ওহুদের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ-

"আল্লাহ তায়ালা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের নিকট করেছিলেন তা তো তিনি পুরা করে দিয়েছেন। প্রথমে তারই অনুমতিতে তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫২)

কিন্তু অতঃপর আল্লাহর সাহায্য কেন উঠিয়ে নেয়া হয় তা সূরা আলে ইমরানের ১৫২নং আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে যা বলা হয়েছে তা অবশ্যি মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয়। এখানে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো ঃ

১. তোমরা দুর্বলতা দেখালে।
২. তোমরা মত পার্থক্য করলে।
৩. নেতার আদেশ অমান্য করে গণিমতের মালের পেছনে লেগে গেলে।
৪. তোমাদের মধ্যে কিছু ছিল দুনিয়ার স্বার্থান্বেষী আর কিছু পরকাল-কামী।
৫. আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করলেন কিন্তু মুমিনদেরকে রক্ষা করে দিলেন।
৬. রাসূলের আহ্বান সত্ত্বেও তোমরা পলায়নপর হয়ে চলে যাচ্ছিলে।
৭. এ ঘটনার বিশ্লেষণে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিল এভাবে যে, কেউ এখানে না আসলে মারা যেত না।

এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে হিদায়াত দান করলেন এবং

www.bjilibrary.com

চূড়ান্ত ঘোষণা শোনালেন সূরা আলে ইমরানে ১৬০নং আয়াতে।

اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ، وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

"আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে কোন শক্তিই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদের অপদস্থ করেন তবে কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? কাজেই প্রকৃত মুমিন আল্লাহর উপরই ভরসা রাখে।"

খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ঃ

আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে সূরা আহযাবের ৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا-

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের প্রতি খোদার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন শত্রুর সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হয়ে এসেছিল তখন আমরা তাদের উপর এক প্রবল ঝটিকা পাঠিয়ে দিলাম এবং তোমরা দেখতে পাওনা এমন এক সৈন্য বাহিনী পাঠালাম। তোমরা যা কিছু করছিলে তা আল্লাহ দেখছিলেন।"

হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ঃ

সূরা তাওবার ২৫ ও ২৬নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ-اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ- ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا-

"আল্লাহ ইতিপূর্বে বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এই সেদিন হুনায়েনের যুদ্ধের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্যের অহংকার ও অহমিকা ছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই আসেনি। যমীন তার অসীম বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। আর তোমরা পশ্চাদপসারণ করে পালিয়ে গেলে।

www.bjilibrary.com

অতঃপর আল্লাহ তার শান্তির অমিয় ধারা রাসূল ও ঈমানদার লোকদের উপর বর্ষণ করলেন আর এমন এক বাহিনী পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাওনি।"

এ পর্যন্ত বদর, ওহুদ, খন্দক ও হুনায়েনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে আল্লাহর সাহায্য ও তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আলোচনা করলাম। এসব আলোচনায় আল্লাহ কখন সাহায্য করেন এবং কখন সাহায্য সংকুচিত করেন তার উল্লেখ পাওয়া গেল।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন ঃ

কুরআনে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির কিছু সরাসরি শর্তেরও উল্লেখ আছে। সূরা হজ্জের ৪০নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهَ مَنْ يَّنْصُرُهٗ -

"আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন যে আল্লাহকে সাহায্য করবে।"

সূরা মুহাম্মদের ৭নং আয়াতে বলেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ-

"হে ঈমানদার বান্দাগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমগুলোকে দৃঢ় মজবুত করে দিবেন।"

সূরা ছফ-এ বলা হয়েছে ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ –

"হে মুমিনরা, আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।" বস্তুতঃ আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া বা আল্লাহর সাহায্য করা মানে আল্লাহর দ্বীনের বা একামাতে দ্বীনের তথা ইসলামী আন্দোলনের সাহায্যকারী হওয়া।

সূরা হজ্জের ৬০নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ-

"যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিবে, [তার উচিত"] যেরূপ তাদের প্রতি করা হয়েছে [সেরূপ নেয়া] অতঃপর যদি তার উপর বাড়াবাড়ি করা হয় তবে আল্লাহ অবশ্যই তার সাহায্য করবেন।" কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতনের মুকাবিলায় চূড়ান্ত পর্যায়ে মুমিনদেরকে রক্ষা করার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা করেছেন ঃ

كَذٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

www.bjilibrary.com

"এমনিভাবে আমি মুমিনদেরকে রক্ষা করি।" তেমনি মুমিনদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব বলে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে ঃ

وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

"অবশ্যি মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।" (সূরা রূম ঃ ৪৭)

ইসলামী আন্দোলনের বিজয় যা ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

(সূরা সফের ১৩নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

"অপর একটি জিনিস (ইসলামী বিপ্লব) যা তোমরা কামনা কর তা, আল্লাহর সাহায্য আসলে বিজয় অতি নিকটে, মুমিনদের জন্য সুসংবাদ।"

সূরা ফাতহের ২০নং আয়াতেও অনুরূপ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঃ

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا-

"আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল ধন-সম্পদ (গণিমত) দান করার ওয়াদা করছেন যা তোমরা অবশ্যই লাভ করবে। বিদ্যুৎগতিতেই তো তিনি এই বিজয় তোমাদেরকে দিলেন। আর লোকদের হাত তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হওয়া থেকে বিরত রাখলেন। এটা যেন মুমিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ তোমাদেরকে সরল সোজা পথের হেদায়াত দান করেন।"

আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী হিসাবে বিরোধী শক্তির মনে ভয় ও আতংক সৃষ্টি করে দিবেন এমন কথাও বলা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৫০-১৫১নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ-

"বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" এরপর বলা হয়েছে ঃ

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ-

"শীগগিরই সে সময় আসবে, তখন কাফিরদের মনে ভয় ও ভীতি সৃষ্টি করে

www.bjilibrary.com

দিব।" আল্লাহর এই সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন তার নবীকে ঃ

رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا النَّصِيْرًا-

"হে আমার রব, আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটি সাহায্যকারী রাজশক্তি দান কর।" আল্লাহর এই সাহায্য ও বিজয়ই ইসলামী বিপ্লবের চাবিকাঠি। যা আল্লাহ তায়ালা সূরা নাসর-এ বলেন ঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا-

"যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসে তখন দেখতে পাবে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হয়েছে।"

আল্লাহর এই সাহায্য ও বিজয় লাভের মৌলিক কর্মসূচী সূরা ছফ-এ যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো ঃ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ-

"তোমরা দৃঢ়ভাবে ঈমান পোষণ কর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা।"

ইসলামী বিপ্লবের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের জন্য বহু শর্ত ও গুণাবলীর কথা উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি।

বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

১. মুমিনরা একটি মজবুত দল যা নেতার আদেশ মেনে চলবে এবং পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে।
২. সে দলটি এমন শক্তি অর্জন করবে যা বিরোধী শক্তি তাদের জন্য হুমকি মনে করে অত্যাচার নির্যাতন করেই কেবল ক্ষান্ত হবে না সরাসরি সশস্ত্র হামলা করতে এগিয়ে আসবে।
৩. বিরোধী শক্তির অত্যাচার নির্যাতনে ধৈর্য অবলম্বন করবে কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে সাধ্যমত মোকাবেলা করবে।
৪. সম্মুখ সমরে কোনরূপ দুর্বলতা দেখাবে না।
৫. যে কোন পরিস্থিতিতে নেতার আদেশে ময়দানে টিকে থাকবে। কোন অবস্থাতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

www.bjilibrary.com

৬. গণীমতের মাল তথা দুনিয়ার সম্পদ লাভের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়ে আখিরাতের কল্যাণের দিকে গুরুত্ব প্রদান করবে।
৭. সংখ্যাধিক্যের অহমিকায় যেন পেয়ে না বসে সেদিকে খেয়াল রাখবে।
৮. সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্যের কামনা করবে।
৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলবে।
১০. কেবলমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল বা ভরসা করবে।
১১. কেবলমাত্র চরম অবস্থা ও চূড়ান্ত পর্যায়েই আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায়।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন আজ কায়েমী স্বার্থের মুকাবিলার মুখোমুখী। এ পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই আসবে অত্যাচার, নির্যাতন। সবর ও তাওয়াক্কুলের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে এবং আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহর সাহায্য পেলে জনগণকে সাথে নিয়েই এ দেশের মাটিতে ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে হবে। নেতৃবৃন্দকে হতে হবে অত্যন্ত সজাগ ও হুঁশিয়ার।

www.bjilibrary.com

শেষ কথা

"ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন" বইটিতে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে ঃ

১. ইসলামী বিপ্লব কি, কেন ও কিভাবে;

২. ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠনের ভূমিকা ও গুরুত্ব;

৩. ইসলামী বিপ্লব সাধনে আল্লাহর সাহায্যের শর্তবলী।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠনের মানই প্রধান বিষয়। সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীর যথার্থ মান অর্জিত হলেই প্রকৃত অর্থে একটি মুমিনে সালেহ দল গঠিত হবে। কুরআনে একেই এ দুনিয়ায় মুমিনদেরকে খেলাফত দানের শর্ত হিসাবে পেশ করা হয়েছে। আর এ শর্ত পূরণ হলেই আল্লাহর সাহায্য লাভের পথ তৈরী হবে। হাদীসে যে কথা বলা হয়েছে "সংগঠনের উপর আল্লাহর হাত"– সে সংগঠনের গুরুত্বই সবচেয়ে বড়। আর সে সংগঠনেরই অভাব বর্তমান মুসলিম সমাজে সবচেয়ে বেশী।

হালে বিভিন্ন মুসলিম দেশে যেসব ইসলামী আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেসব ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত সংগঠন মান অর্জনে কতটুকু সাফল্য লাভ করল তার উপরই আগামী দিনের ইসলামী বিপ্লব নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে প্রধান সমস্যা হলো বিভিন্ন স্তরে মান মোতাবেক নেতৃত্ব এবং জনশক্তির মান। যোগ্যতাসম্পন্ন ও মান মোতাবেক নেতৃত্ব এবং জনশক্তির তীব্র আকাঙ্খা, তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তৎপরতা ব্যতীত একটি যথার্থ সংগঠন গড়ে উঠতে পারে না। আর তা না হলে ইসলামী বিপ্লব সাধনও সম্ভব নয়।

আজকের ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত জনশক্তি নিঃসন্দেহে ইসলামী বিপ্লব কামনা করে। কিন্তু এর জন্য যে সংগঠনের মজবুতির প্রয়োজন তা অর্জনে কি জনশক্তি তৎপর? জনশক্তির মধ্যে কি সে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও কর্মতৎপরতা সৃষ্টি হয়েছে? চাহিদা পূরণ না করে শুধু কামনা কি ফল দিতে পারে?

আন্দোলনের জনশক্তির মনে প্রশ্ন– কি করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধী শক্তির কুটিল চক্রান্তের মোকাবেলা করবে ইসলামী আন্দোলন? আমার জিজ্ঞাসা– আমরা

www.bjilibrary.com

কি আল্লাহর সাহায্য নিয়ে ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে চাই, না কি নিজেদের শক্তি বলেই ইসলামী বিপ্লব সাধনে সক্ষম হব বলে মনে করি? যদি আল্লাহর সাহায্য বলেই তা সম্ভব বলে মনে করি তাহলে অবশ্যি অবশ্যি একটি মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার শর্ত পূরণ করতে হবে। আর আল্লাহর সাহায্য লাভে যদি আমরা সক্ষম হই তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাদের রুখতে পারবেনা।

তাই একটি মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার শর্তাদি পূরণই আজকের ইসলামী আন্দোলনের সময়ের দাবী। এ দাবী পূরণে আমরা সক্ষম হলেই কেবলমাত্র আমরা লাভ করব আমাদের ইপ্সিত ধন "ইসলামী বিপ্লব।"

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ- (سورة الصف : ١٣)

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করলে বিজয় নিকটবর্তী এবং মুমিনদের জন্য সেই সুসংবাদ।

- সমাপ্ত -

www.bjilibrary.com